উন্মেষ

টাকি গভর্নমেন্ট কলেজ পত্রিকা

নাস্তি বিদ্যাসমং চক্ষুঃ
নাস্তি সত্যসমং তপঃ।
নাস্তি রাগসমং দুঃখং
নাস্তি ত্যাগসমং সুখম্।।

(There are no better eyes than those knowledge gives,
no greater asceticism than the worship of truth,
no greater sorrow than those bred from passions,
no greater bliss than found in renunciation.)

উন্মেষ

টাকি গভর্নমেন্ট কলেজ পত্রিকা

ESTD.1950
Taki Government College

TAKI GOVERNMENT COLLEGE

(Affiliated to West Bengal State University)

Taki, Dist. North 24 Parganas, West Bengal 743 429

‘উন্মেষ’

টাকি গভর্নমেন্ট কলেজ পত্রিকা (২০২২-২০২৩)

প্রকাশ:
ড: শান্তা মুখোপাধ্যায়,
ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষা,
টাকি গভর্নমেন্ট কলেজ কর্তৃক প্রকাশিত
জুলাই ২০২৩

প্রকাশক:
টাকি গভর্নমেন্ট কলেজ
(পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত)
টাকি, উত্তর ২৪ পরগণা, পঃ বঃ-৭৪৩ ৪২৯
দূরভাষ : ০৩২১৭ ২৩৪৪৭৪
Website : www.tgc.ac.in

প্রচ্ছদ অলংকরণ:
ড. দেবাশীষ দাস

মুদ্রণ, বর্ণবিন্যাস ও অলংকরণ:
লেজার ওয়ার্ল্ড
পি-৪এ, সি.আই.টি. রোড, কলকাতা ৭০০ ০১৪
মোবাইল : ৯৮৩১১ ৬১৯৬১
ই-মেল : laserworld92@gmail.com

‘উন্মেষ’

টাকি গভর্নমেন্ট কলেজ পত্রিকা (২০২২-২০২৩)

সম্পাদক:

ড. ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

পত্রিকা সম্পাদনা সমিতি

ড. জয়ন্ত মিস্ত্রী

সঞ্চিতা চক্রবর্তী

নিলাদ্রী টিকাদার

বিশ্বজিৎ দাস

সিদ্ধার্থ প্রতিম সিন্‌হা

ড. তমোনাশ চক্রবর্ত্তী

ড. রিঙ্কু বেহারা

ড. রমাপ্রসাদ আদক

ড. তারকনাথ জাঁটুয়া

ড. সৈকত সাঁতরা

ড. দেবপ্রিয়া রাজলক্ষ্মী দাস

রেহানা খাতুন

ড. দেবাশীষ দাস

ড. রাহুল বসু

বনানী গাঙ্গুলী

অরুন্ধতী মিশ্র

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

❖ সম্পাদকীয় xi

❖ ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষার কলমে xiii

❖ কবিতা

১. ব্যালকনি ১
— ওমর ফারুক গাজী (কাঠগোলাপ), ৫ম সেমেস্টার, ইতিহাস বিভাগ (অনার্স)

২. অভিমান ১
— ওমর ফারুক গাজী (কাঠগোলাপ), ৫ম সেমেস্টার, ইতিহাস বিভাগ (অনার্স)

৩. সময় নেই ২
— জয়শ্রী গায়েন, ৫ম সেমেস্টার, ইতিহাস বিভাগ (অনার্স)

৪. নারী ৩
— জয়শ্রী গায়েন, ৫ম সেমেস্টার, ইতিহাস বিভাগ (অনার্স)

৫. পুতুলভাঙ্গা ৪
— প্রীতম ঘোষ, ১ম সেমেস্টার, ইংরাজি বিভাগ (অনার্স)

৬. লাইব্রেরী ৪
— মৌমিতা মুখার্জী, ৩য় সেমেস্টার, ভূগোল বিভাগ (অনার্স)

৭. নারীর সম্মান ৫
— অঙ্কিতা রায়, ইংরাজী বিভাগ (অনার্স)

৮. উড়ান ৫
— আকীব গাজী, ৩য় সেমেস্টার, বি.এস.সি বিভাগ (জেনারেল)

৯. দ্বিধায় বাঁচি ৬
— প্রকৃতি সরকার, ৩য় সেমেস্টার, ভূগোল বিভাগ (অনার্স)

১০. শিক্ষা ৬
— সুমিত্রা দে, ৩য় সেমেস্টার, ইংরাজী বিভাগ (অনার্স)

১১. খিদে ৭
— এম.এ., প্রাক্তন ছাত্র, বাংলা বিভাগ

১২. মেঘলা বসন্ত ৭
— ঋতুপর্ণা বিশ্বাস, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, ভূগোল বিভাগ

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

১৩. মিনু ৮
— অভীক ঘোষ, এস.এ.সি.টি., ইংরাজি বিভাগ

১৪. বেকারত্বের প্রশ্ন ৯
— সৌভাগ্য মিস্ত্রী, ৪র্থ সেমেস্টার, বোটানি বিভাগ (অনার্স)

১৫. আমি মেয়ে তাই? ৯
— অঙ্কনা সরকার, ৪র্থ সেমেস্টার, দর্শন বিভাগ (অনার্স)

১৬. ব্যথা ১০
— অজয় ঋষিদাস, ৪র্থ সেমেস্টার, বাংলা বিভাগ (জেনারেল)

১৭. মুক্তি ১০
— সাহিন আক্তার কারিকর, প্রাক্তন ছাত্র, ইতিহাস বিভাগ (অনার্স)

১৮. বহুদূর... ১১
— রামকৃষ্ণ নায়েক, প্রাক্তন ছাত্র, ইতিহাস বিভাগ (অনার্স)

১৯. বাবলি তোর জন্য ১২
— রামকৃষ্ণ নায়েক, প্রাক্তন ছাত্র, ইতিহাস বিভাগ (অনার্স)

২০. দেহান্তর ১২
— সাহিন আক্তার কারিকর, প্রাক্তন ছাত্র, ইতিহাস বিভাগ (অনার্স)

২১. অধ্যক্ষ মহাশয়ের স্মরণে ১৩
— আল-হুদা বিন আজম, স্নাতক, গণিত বিভাগ (২০২১)

২২. প্রিয় ১৩
— কৌশিক রঞ্জিত, স্নাতক, গণিত বিভাগ (২০২২)

২৩. কল্পনা ১৪
— আকাশ মণ্ডল, ষষ্ঠ সেমেস্টার, গণিত বিভাগ

২৪. আমি ডাস্টবিনের আর্তনাদ ১৪
— আমিরুল খান, স্নাতক, গণিত বিভাগ (২০২২)

২৫. নীরব পৃথিবী ১৫
— শুভম গাইন, ষষ্ঠ সেমেস্টার, গণিত বিভাগ

২৬. মানুষ যেন সস্তা ১৫
— সেখ ইরফান করিম, স্নাতক, গণিত বিভাগ (২০২১)

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

২৭. Realization of Reality — ১৬
— Poulomi Das, 5th Semester, English Hons.

২৮. Me to myself — ১৬
— Poulomi Das, 5th Semester, English Hons.

❖ গল্প

১. সদর দরজা — ১৭
— অরুন্ধতী মিশ্র, এস.এ.সি.টি., উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ

২. স্ত্রৈণ — ১৯
— ড. জয়ন্ত মিস্ত্রী, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ

৩. মায়াঙ্ক — ২১
— শৌভিক বিশ্বাস, ৩য় সেমেস্টার

৪. মুক্তি — ২২
— পূর্ণিমা ভঞ্জ, ৩য় সেমেস্টার, বাংলা (এম.এ.)

৫. প্রতিশ্রুতি — ২৪
— জুয়েল রাণা মাসুদ, ষষ্ঠ সেমেস্টার, প্রাণীবিদ্যা বিভাগ (অনার্স)

৬. টার্গেট — ২৬
— টুকাই সরকার, ৪র্থ সেমেস্টার, বি.এস.সি (বায়ো জেনারেল)

৭. মহাকাশের মহাঅতিথি — ২৮
— আকিব গাজী, ৩য় সেমেস্টার, বি.এস.সি (জেনারেল)

৮. কলেজস্ট্রিটে কলরব — ৩৪
— শুভজিৎ বিশ্বাস, ৩য় সেমেস্টার, ফিজিক্স বিভাগ (অনার্স)

৯. মূল্যবান সময় — ৪০
— নাসিফা খাতুন, ৫ম সেমেস্টার, ভূগোল বিভাগ (অনার্স)

১০. সোনা নাপিতের সেলুন — ৪১
— হাসানুজ্জামান সরদার, ১ম সেমেস্টার, গণিত বিভাগ (অনার্স)

১১. একটি স্বপ্নের উড়ান — ৪২
— অর্ক মণ্ডল, গণিত বিভাগ (২০২১)

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

১২. কৃপণ ও দানবীর ৪৫
— ড. শান্তা মুখোপাধ্যায়, ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষা, টাকি গভের্নমেন্ট কলেজ

১৩. বাদাম ৪৮
— অনুলেখা দাস, বিজ্ঞান স্নাতক (২০২১)

❖ প্রবন্ধ

১. ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নিযুক্ত ভারতবর্ষে উদ্ভিদবিদ্যা গবেষণার অগ্রপথিক উইলিয়াম রক্স্‌বার্গ ৫০
— শুভ্রদীপ দে, অধ্যাপক, উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ

২. খাদ্য সুরক্ষায় উদ্ভিদ বৈচিত্রের ভূমিকা ৫৩
— ড. শৌভিক দাশ, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ

৩. ভাষা আন্দোলনের সূচনার দিনগুলি ৬০
— ড. উত্তম কুমার দাস, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ

৪. মহাবিশ্ব দর্শন — জেমস্ ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ ৬২
— ড. রমা প্রসাদ আদক, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, পদার্থবিদ্যা বিভাগ

৫. ফাহিয়েন ভারতভ্রমণ-ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে ৬৫
— সায়ন মণ্ডল, ৫ম সেমেস্টার, ইতিহাস বিভাগ (অনার্স)

৬. WETLAND : The Nature's Kidney ৬৬
— Bidisha das, 4th Semester, B.Sc., Botany (Hons.)

৭. How Concept of Cone is used for Ordering of Elements in Real Linear Spaces ৬৭
— Dr. Koushik Das, Assistant Professor, Dept. of Mathematics

৮. Secret Sharing: The Mathematics Behind It ৬৯
— Dr. Jyotirmoy Pramanik, Assistant Professor, Dept. of Mathematics

৯. Basic Changes In Education To Change The Nation ৭১
— Pritam Mondal, Graduate, Dept. of Mathematics (2022)

১০. Theory of Everything? ৭৪
— Soumyajit Mondal, Graduate, Dept. of mathematics (2021)

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

১১. Bioluminescene — ৭৬
— Purabi Sarkar, B.Sc., Passed Out (2021)

❖ ফিরে দেখা

১. টাকি কলেজের সোনালী দিন — ৮৬
— সীমা গঙ্গোপাধ্যায়, প্রাক্তন ছাত্রী

❖ ভ্রমণ বৃত্তান্ত

১. একজন ইতিহাসের ছাত্রের চোখে হাজারদুয়ারি ভ্রমণ — ৮৯
— সালাউদ্দিন সরদার, ৪র্থ সেমেস্টার, ইতিহাস বিভাগ (অনার্স)

❖ বিচিত্র

১. ম্যাজিকাল কেমিস্ট্রি (Magical Chemistry) — ৯৩
— তনয়া ঘোষ, ৪র্থ সেমেস্টার, বি.এস.সি, কেমিস্ট্রি বিভাগ (অনার্স)

২. এক আদর্শ সমাজের সন্ধানে — ৯৭
— শ্রমণা ধর, সহকারী অধ্যাপক, গণিত বিভাগ

৩. শিক্ষা তো কেবল ব্যাক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণের চাবিকাঠি নয়! — ৯৮
— শেখ আব্দুল মাবুদ, স্নাতক, গণিত বিভাগ (২০২২)

৪. গণিত কেন পড়বো — ৯৯
— শেখ আব্দুল মাবুদ, স্নাতক, গণিত বিভাগ (২০২২)

৫. The Abel Prize — ১০০
— Sahani Parvin, Graduate, Dept. of Mathematics (2021)

৬. মটন কষা — ১০১
— শুভদীপ ঘোষ, বিজ্ঞান স্নাতক, ৪র্থ সেমেস্টার

৭. হান্ডি মটন — ১০৪
— অভীক মণ্ডল, বিজ্ঞান স্নাতক, ৪র্থ সেমেস্টার

৮. জীবন ও অবসাদ — ১০৬
— দিয়া পাল, বিজ্ঞান স্নাতক (২০২১)

❖ চিত্রাবলী — ১০৮-১৩০

সম্পাদকীয়

"আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে।
এ জীবন পূণ্য করো দহন দানে।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চৈত্রের নিদাঘ দহনে রঙীন, শান্ত, স্নিগ্ধ বসন্ত যখন অন্তর্হিত, প্রকৃতি যখন তার শ্যামলীমা হারিয়ে রুক্ষ, শুষ্ক; যখন তপ্ত ধরিত্রীকে একটু সিক্ত করার জন্য কালবৈশাখী ঝড়ের হাহাকার; চৈত্র অবসানে বাংলা নববর্ষ ১৪৩০-এর আনন্দঘন সূচনায় যখন অনুভূত হচ্ছে তীব্র দহনজ্বালা; যখন গোটা বাংলা জুড়ে চলছে 'রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী' পালনের প্রস্তুতি — তখন 'আলোর ঝলকের মতো' একগুচ্ছ নবীন প্রতিভার স্ফুরণ নিয়ে, কলেজ-পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীদের বহুবিধ ভাবনা-চিন্তার ডালি নিয়ে, তাদের নানা আঙ্গিকের লেখনী নিয়ে আমাদের মাঝে আত্মপ্রকাশ করতে চলেছে পঁচাত্তরের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যাওয়া ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান টাকি সরকারি মহাবিদ্যালয়ের পত্রিকা 'উন্মেষ'। অতিমারি পেরিয়ে কলেজে ছাত্রছাত্রীদের আগমন ও নিয়মিত পঠন-পাঠন আরম্ভ হতেই 'কলেজ ম্যাগাজিন' প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। নানান প্রতিকূলতা পেরিয়ে অবশেষে সেই মহতী উদ্যোগ সার্থক হতে চলেছে; নব কলেবরে উন্মোচিত হতে চলেছে ইছামতী'র তীরে গড়ে ওঠা গৌরবোজ্জ্বল টাকি সরকারি মহাবিদ্যালয়ের পত্রিকা — 'উন্মেষ' এর। এটি আমাদের পরম প্রাপ্তি।

'উন্মেষ'-এ আমাদের বর্তমান ছাত্রছাত্রীদের গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, ভ্রমণ বৃত্তান্ত-সহ নানান সৃষ্টিশীল ও বৈচিত্রপূর্ণ রচনা এবং তাদের আঁকা ছবি যেমন স্থান পেয়েছে তেমনি এখানে কলেজের বর্তমান অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের (এস.এ.সি.টি.সহ) বিভিন্ন স্বাদের লেখা, প্রাক্তনীদের লেখাও সন্নিবেশিত হয়েছে। পত্রিকার মান ও স্থান সংকুলানের কথা ভেবে অনেকের সৃজনধর্মী লেখা এখানে স্থান পায়নি; সেজন্যে পত্রিকা সম্পাদক হিসেবে আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

যাঁদের সক্রিয় সহযোগিতা, পরামর্শ ও উৎসাহ ছাড়া পত্রিকাটির প্রকাশ দুঃসাধ্য ছিল তাঁরা হলেন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষা ড. শান্তা মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক সংসদের সম্পাদক শ্রী অরুণাংশ মাইতি এবং 'কলেজ ম্যাগাজিন কমিটি'র সব সম্মাননীয় সদস্য-সদস্যাগণ। আমাদের আবদারে সাড়া দিয়ে 'উন্মেষ'-এর প্রচ্ছদ অলংকৃত করেছেন প্রাণীবিদ্যা বিভাগের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ড. দেবাশীষ দাস মহোদয়। এঁদের প্রত্যেকের কাছে আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

'উন্মেষ'-এর উন্মেষে আমাদের প্রিয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রী, অধ্যাপক, অধ্যাপিকা (এস.এ.সি.টি. সহ), শিক্ষাকর্মী, 'ছাত্র সংসদে'র প্রতিনিধিবৃন্দ, প্রাক্তনী-প্রত্যেকের কাছ থেকে অকুন্ঠ সাহায্য, সহযোগিতা

পেয়েছি। এজন্য আমি সবাইকে আমার পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ ও অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই। সবার সর্বাত্মক সহযোগিতায় ও অংশগ্রহণে 'উন্মেষ' অবশেষে 'দিনের আলো' দেখতে চলেছে — এটা আমাদের সবার কাছে পরম আনন্দের।

আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও পত্রিকায় কোন খামতি থাকলে, অসাবধানতাবশতঃ কোন মুদ্রণ প্রমাদ থাকলে পত্রিকা সম্পাদক হিসেবে আমি সব ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য মার্জনা চেয়ে নিচ্ছি।

আমাদের ছাত্রছাত্রীরা তাদের পড়াশোনা ও প্রত্যাশার চাপ সামলে, তাদের গতানুগতিক জীবন, চাওয়া-পাওয়া থেকে বেরিয়ে এসে আরো আন্তরিকতার সাথে, নিবিড়ভাবে এই পত্রিকাটির সঙ্গে যুক্ত হবে, 'উন্মেষ'-এর হাত ধরে তাদের প্রতিভার আরো বিচ্ছুরণ ঘটবে, তাদের সৃষ্টিশীলতার নানান দিক আরো বেশি বেশি করে উন্মোচিত হবে, সবাইকে চমৎকৃত করবে; সর্বোপরি শিক্ষাঙ্গনে সুস্থ সংস্কৃতির জোয়ার আনবে — এই আশা রাখি। সবশেষে বলি — ''শতফুল বিকশিত হোক, যত আগাছা নির্মূল হোক''।

ড. ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য
সম্পাদক

ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষার কলমে

চৈত্রের দাবদাহে দগ্ধ চরাচর। তাপ দহন এড়াতে গৃহকোণ খুঁজে নিতে ব্যস্ত আমরা। তেমনই আর্থ সামাজিক প্রেক্ষিত যে দহনবার্তা বয়ে আনছে তাকেও এড়াতে মনে মনে কোন নিভৃত ছায়া খুঁজে নিতে ব্যস্ত আমরা, কোভিড পরবর্তী শিক্ষাচিত্র আশাব্যঞ্জক নয়। শিক্ষা যে জীবনের মূল ভিত্তি এই সারসত্যটুকুও বর্তমান সময় স্বীকার করছে কি ?

তীব্র তাপদাহের পর গ্রীষ্মের বিকেল যেমন বয়ে আনে জুঁই বা বেলীর সুবাস ...... শীতল স্পর্শ, তেমনই কলেজের পত্রিকা এই দহনকালেও বয়ে নিয়ে এসেছে ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক শিক্ষিকা, অফিসকর্মী ও প্রাক্তনীদের মেধা ও মননের সুবাস।

এই সুবাসটুকু ধরে রাখতে হবে। কলেজ ম্যাগাজিন কমিটির শ্রমের রেকাবিতে কলেজ সংশ্লিষ্ট সকলের নিবিড় লালনের জলসিঞ্চনে তা হবে বলেই আমার বিশ্বাস।

তবেই হবে বোধ ও চেতনার উন্মেষ যা পত্রিকার নামকরণকে সার্থক করে তুলবে।

ড: শান্তা মুখোপাধ্যায়,
ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষা,
টাকি গভর্নমেন্ট কলেজ

ব্যালকনি

ওমর ফারুক গাজী (কাঠগোলাপ),
৫ম সেমেস্টার, ইতিহাস বিভাগ (অনার্স)

কলেজের ব্যালকনি, তুই আর আমি
না বলতে পারা কিছু কথা, কিছু আবেগ,
কিছু মায়া, তার সাথে কিছু ভয়।

তেমন কিছুনা, একটা সম্পর্ক বন্ধুত্ব নামের
শক্ত কোনো টানে বাধা।
ছিঁড়তে চাওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা।
তবু কিছু দ্বিধায় বারবার পা এগিয়ে
ফিরে আসা, বন্ধুত্বটা অনেক দামি,
হয়তো তার থেকেও দামি কিছু আছে,
তবে আজ সেটা একপাক্ষিক।

সে গলিতে পা বাড়াতে বারণ,
পাছে বন্ধুত্ব নামের সুতোতে টান পড়ে।
তবু ব্যর্থচেষ্টা, দুই জনেই জানে
হয়তো সম্পর্কটা আর বন্ধুত্বে বেঁচে নেই,
গিয়েছে আরও গভীরে।
বন্ধুত্বটা তো ছদ্মনাম মাত্র।

অভিমান

ওমর ফারুক গাজী (কাঠগোলাপ),
৫ম সেমেস্টার, ইতিহাস বিভাগ (অনার্স)

আমি তোর আবদার রাখতে পারেনি
কেননা অতীত আমার বার বার পিছুটানে
তোর আবদারের মতো তারও ছিল আবদার
কিন্তু জানিস,
সেই আবদারগুলো ভাঙা স্মৃতির ঘরে
মাথাঠুকে মরে।
আবদার গুলো স্মৃতিতেই বেশি মানায়।

তার ও ছিল এতটুকু আবদার
একটা নীল পাঞ্জাবী পরা, একটা গোলাপ
নিয়ে দাড়িয়ে থাকা অগোছালো
ছেলেটাকে দেখবার।
অগোছালো ছেলে আছে নেই আবদার করার
সেই মানুষটা

আজও তাই একই আবদার
না রাখতে পারার ব্যার্থতা তাকে
বার বার গুছিয়ে দেওয়া মানুষটার কথা
জানান দিয়ে যাচ্ছে।

গল্পটা হয়তো অর্ধেক রাস্তাতেই
হারিয়েছে কোনো গলির বাঁকে।

কিন্তু ফেলে যাওয়া কিছুর স্মৃতির বোঝা
নিয়ে গোছালো ছেলেটা আজও
এ গলি সে গলিতে ঘুরে বেড়ায়।

আর নীল পাঞ্জাবি সে আজও পরিনি
তোলা আছে অভিমানের
চিলে কোঠায়।

সময় নেই

জয়শ্রী গায়েন,
৫ম সেমেস্টার, ইতিহাস বিভাগ (অনার্স)

মানুষ বড়োই অসহায়
অত্যাচারিত, লাঞ্ছিত, অবহেলিত
যে মানুষ দু-পায়ে ভর করে
দু-হাত বাড়িয়ে
উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে
এই সমাজ যাদেরকে
মাথা উঁচু করে বাঁচতে দিচ্ছেনা,
দিনের পর দিন শোষণ করে চলেছে
তাদেরকে সাহায্য করার কারো
সময় নেই।

কারখানার চিমনির ধূমায়িত অগ্নিগর্ভে
যারা পৌঁছে দিয়েছে আগুনের ভাষা
নিবিড় অন্ধকার খনিগর্ভে যারা জুগিয়েছে
সুসমুজ্জ্বল নতুন দিনের সুসমাচার,
ঢলে পড়া ধানের মাথাকে যারা দাঁড় করিয়েছে
তাদের দিকে সাহায্যের
হাত বাড়ানোর কারো
সময় নেই।

বিজ্ঞান মানুষকে করে নিয়েছে নিজের বাস
যন্ত্র করেছে যান্ত্রিক
প্রকৃতির সৌন্দর্য সে ভুলে গেছে
ভুলে গেছে, প্রকৃতির অতীত জাদু
তাই, প্রকৃতিকে উপলব্ধি করার তার আজ
সময় নেই।

বর্তমান দাঁড়িয়ে আছে অতীতের উপর
আর অতীত হলো ইতিহাসের আয়না
যাকে সামনে রেখে নানা ঐতিহাসিক
লিখেছে নানা বই, নানা গ্রন্থ
তাই, আজ বই পড়েই
শিক্ষা অর্জন করা হয়
ইতিহাসকে খুঁটিয়ে দেখার কারো আজ
সময় নেই।

নারী

জয়শ্রী গায়েন,
৫ম সেমেস্টার, ইতিহাস বিভাগ (অনার্স)

পুরুষ তোমায় প্রেমিকা বানায়
অন্দর মহল সাজে
সেই পুরুষই তোমায় পণ্য বানায়
পতিতালয়ে খোঁজে
রাস্তা ঘাট কিংবা নিজ গৃহে অবরুদ্ধ
নারী ধর্ষিতা হয় শেষে।

কুসংস্কারের বেড়া জালে
রক্ষা পায়নি সেও
ডাইনি, পিশাচ কলঙ্ক সে
মেখেছে গায়ে।

নারী শিশুর জন্ম দেওয়ায়
অত্যাচারিত বধু
কখনও বা ভ্রূণ হত্যায় জমে
ধ্বংসের স্তুপ।

নারী নাকি স্বাধীন তুমি
পায়ের বাঁধন মুক্ত
হাত কড়া আর নেইকো হাতে
চালাও তুমি অস্ত্র।

পুরুষ তোমার সঙ্গী সাথী
পা মিলিয়ে চলো।
ভয়ডর সব পেছনে ফেলে
বন্দুক কাঁধে তোলো।

লালসা মাখা সমাজটাকে
দমিয়ে রাখো পিছে
দুষ্টের দমন সুষ্ঠু হাতে
কুস্তি, ক্যারাটেতে।

অলিম্পিকে বিশ্বজয়ী
ভারতীয় নারী পিভি সিন্ধু পদক জয়ী,
চাম্পিয়ানশিপ এখন নারীর হাতে
তাহলে ভয় কেন আজ
পিছিয়ে থেকে?

কোনঠাসা এই সমাজ থেকে
শক্ত পায়ে দাঁড়াও
রাজনীতিতে দস্যি নারী
নিজের হাতে সমাজ
তুমি বানাও।

গৃহের লক্ষ্মী সদাই তুমি,
সদাচারে রও
অন্নপূর্ণা, অন্নরূপা, দশভূজা
ত্রিলোক জননী।

মন্দিরেতে ঘন্টা বাজে, কাঁসর বাজে
নারীর পূজা হয়
সেই তো নারী শত্রু বধে
ত্রিশূল নিয়ে ধায়।

কাঁদতে নারী হাসতে নারী
প্রতিশোধে জ্বলে
আড়াল করা ঘোমটা থেকে
তেজস্বী রূপ ধরে।।

পুতুলভাঙা

প্রীতম ঘোষ,
১ম সেমেস্টার, ইংরাজি বিভাগ (অনার্স)

সারাদিন শুধু পুতুল নিয়ে খেলতাম বলে —
মাগো! তুমি আমার পুতুলটিই দিলে ভেঙে।
মাগো! তোমার কি একটুও কষ্ট হয় না —
সেই পুতুলটির কথা ভেবে?
কুমোরটুলির মেলা থেকে এনেছিলাম মাগো!
৫০টি টাকায় সেটি কিনে।
মাগো! তুমি কিনা অবশেষে সেটিই দিলে ভেঙে।
মাগো! পড়ায় আমার মন বসে না
শুধুই মনে পড়ে পুতুলটির কথা।
ক্ষণে ক্ষণে সেটি আমার চোখে ভেসে ওঠে মাগো!
সে যেন শুধু আমাকেই হাত বাড়িয়ে ডাকে।
খড়ি মাটি দিয়ে তৈরি পুতুলটি —
দেখতে অপরূপ সুন্দর।
তার ডাগর ডাগর নয়ন জোড়ায় —
স্বপ্ন সাজানো আছে প্রচুর।
তার হাসিভরা ঠোঁটে
সে শুধু আমার দিকে অপলক তাকিয়ে হাসত।
মাগো! শুধু সামান্য একটা ভুলে —
মাশুল দিতে হল বেচারা সুন্দর পুতুলটিকে।
ফিরে কি পাবো মাগো! আর সেই পুতুলটিকে?
শুধুই অতৃপ্ত চাওয়া থেকে যাবে মনের মধ্যে।
মাগো! তোমার উপর আমার বেজায় রাগ;
তোমার সাথে কথা বলতেও মানা।
মাগো! ফিরিয়ে দিতে পারবে কি আগের সেই
পুতুলটিকে?
যে ছিল আমার নিত্য খেলার সাথী
তাঁকে ছাড়া আমি বড়োই নিঃসঙ্গ একাকী।

লাইব্রেরী

মৌমিতা মুখার্জী,
৩য় সেমেস্টার, ভূগোল বিভাগ (অনার্স)

পরিচিত পরিবেশ থেকে অপরিচিতের দেশে,
আনকোরা সব দৃশ্য যেন চোখের কোণে ভাসে।
কী যে এখন করি! পাইনা ভেবেই কিছু,
পরিচিত গন্ধের হলাম পিছু পিছু।
অনেক প্রতীক্ষার পরেই এল সেই শুভক্ষণ,
অপেক্ষার অবসানে পরিপূর্ণ মন।
বই গাঁথা সব পাঁচিল রয়েছে চারিদিকে,
সময়ের অগোচরে সবই কেমন যেন ফিকে।
চুপচাপ, টু-শব্দ, মনে-মনে পাঠ;
মগজে-মগজে সংঘর্ষ, পাতায়-পাতায় অনুরাগ।
নীরব সকল প্রহরীরা অবিচল-অবিরত,
কারোর দৃষ্টি বইয়ের ভাজে, কেউ কলমে ব্যস্ত।
কেউ পড়ছে গল্প, কেউ লিখছে শায়েরী;
সব মিলিয়েই জমজমাট আমার প্রিয় লাইব্রেরী।।

নারীর সম্মান

অঙ্কিতা রায়,
৩য় সেমেস্টার, ইংরাজী বিভাগ (অনার্স)

সময় কত বদলেছে,
বদলিয়েছে কত কিছু
নারী পুরুষ আজ সবাই সমান
নেই কোনো উঁচু-নীচু।

আজকের নারীরা সব করছে
পাচ্ছে পুরুষের সম অধিকার
আর সম্মান? সেটাও পাচ্ছে তারা
যারা নজির গড়ছে সাহসিকতার।

সম্মান পাচ্ছে নারী
যখন সে মহাকাশচারী
সম্মান পাচ্ছে তখন
যখন সে এক পাইলট নারী।

সম্মান পাচ্ছে তারাও
যারা চালাচ্ছে বাস, ট্যাক্সি, অটো
সম্মান পাচ্ছে না তারা
যাদের কাজ নয় পুরুষের মত।

সম্মান নেই সেই নারীর
যার নেই কোনো বীরত্ব
সম্মান নেই তার
যার কাজ এক নারীর মত।

উড়ান

আকিব গাজী,
৩য় সেমেস্টার, বি.এস.সি বিভাগ (জেনারেল)

ইচ্ছেগুলো অন্তহীন,
মেলতে চায় ডানা।
কোথাও যেন আঁটকে আছে।
উড়তে তাদের মানা।

ধনীরাই নাকি সুখের চালক,
চলবে তাদের জাহাজ।
গরিবের স্বপ্ন ঝরা পালক,
এটাই নাকি সমাজ।

কারো চাহিদা শুধু নুনভাত,
তবু কেন জোটেনা!
কারো বা ভাতে ভরে আছে পাত,
তবু চাহিদা মেটেনা।

স্বপ্ন দেখে সে, ভোরের চা-টা,
হবে একদিন মনিব,
বেলাশেষ তবু ধুলোমাখা গায়ে,
খালিহাত সেই গরিব।

দ্বিধায় বাঁচি

প্রকৃতি সরকার,
৩য় সেমেস্টার, ভূগোল বিভাগ (অনার্স)

নদীর ওপার তারের কাঁটায়,
বিঁধছে শিকল ঢেউয়ের পরে।
জোয়ার ভাটায় আলেখ্যরা,
গোলমেলে হয় স্রোতের টানে।
ঐ যে, ওপার কাঁছি বাঁধা!
রক্ত যেথা বিষাদ গড়ে,
সেইখানেতেও জন্মে করি,
গীতবিতানের দ্বন্দ্ব নেড়ে।
ঐ যে, ওপার গাছের সারি;
মিলিয়েছে যে সীমানায়!
সেইখানেতেই নতুন শুরু,
যেখানেতে যেমন মানায়।
বিদ্রুপের ঐ গগনফাঁটা —
বাজ সেভাবে সইছে নদী!
উপন্যাসে রটতো বোধহয় —
মাঝে নদীই না থাকতো যদি!
তবে কীসে রুখতো এসব?
রাখতো কেউ ‘নদীর’ খবর
গুলি, তোপেই আঙুল মুখে;
শহরগুলো রইতো সরব।
তবে! সবই বোধহয় নদীর গলদ,
দ্বন্দ্ব বুঝি তার কারণেই!
নাকি, মোদেরও খানিক ভাগিদারি?
কেবল দোষ গেঁথেছি লোকের পরেই।।

শিক্ষা

সুমিত্রা দে,
৩য় সেমেস্টার, ইংরাজী বিভাগ (অনার্স)

আমার ধ্যান, আমার জ্ঞান, আমার দীক্ষা,
আমার একমাত্র সম্পদ আমার শিক্ষা।
টাকা-পয়সা, মূলধন, যদি হয় বিলীন,
সম্পদ হয়ে শিক্ষা তুমি থাকবে চিরদিন।।
না থাকে যদি কূল, মান, জাতি,
শিক্ষা তুমি আমার চিরদিনের সাথী।
অফুরন্ত সম্পদ আমার মনের শিক্ষা,
যা টাকা-পয়সা দিয়েও কেউ দেবে না ভিক্ষা।
আমার মনের যত ভালো,
সব শিক্ষা সেখায় আলো।

তাই শিক্ষার দ্বারা দীক্ষিত,
শিক্ষার ভাষায় আমি শিক্ষিত।।

খিদে

আলামিন সবুজ,
এম.এ., প্রাক্তন ছাত্র, বাংলা বিভাগ

লোকটা ঘোরে পাড়ায় পাড়ায়
কি জানি কোন খিদের তাড়ায়।
যা কিছু পাচ্ছে খাবার —
চেটে পুটে করছে সাবাড়।

মাংস পোলাও কিছুই চায়না
করে শুধু এতটুকু নুন-ভাতের বায়না।
দেখলে তাকে সবাই পালায়,
ঘুরছে তবু খিদের জ্বালায়।

কাবার করে দিচ্ছে জবাব,
লোকটা তবু খিদের নবাব।
দেখছি শুধু পুরছে পেটে,
জলের কলটাও খাচ্ছে চেটে।

আসলে কাছে ভুলেও কভু
ঘেঁষি না তার সামনে তবু।
পথে যেতেই দেখতে পেলাম,
দূর থেকেই ঠুঁকি সেলাম।
এই আমাদের পাষাণ মন
করি মানবতার আমন্ত্রণ।।

মেঘলা বসন্ত

ঋতুপর্ণা বিশ্বাস,
অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, ভূগোল বিভাগ

বসন্তে এক মেঘলা বিকালে-কূজনে মধুসখা;
কানাকুয়া ডাকে আম্র কাননে, হরিৎ তরুর শাখা।
অবারিত মাঠে-ভূমির ললাটে; বহে মৃদু সমীরন,
বজ্র নিনাদে অকাল শ্রাবণের ঘনঘোর আয়োজন।
জলভারে মেঘ সীমানা মুছায়, সঘন গগন ত'লে
ভ্রমরী গুঞ্জে মাধবীকুঞ্জে, কানাকানি জলে-স্থলে;
বুনো শালিখের খুনসুটি আর ছাতারের কলরব —
পুকুরের জলে কালো কালো ছায়া গায়ের অবয়ব;
দীর্ঘদেহী মেহগনি, নিম, শিরিষেরা পাশাপাশি,
ঝরাপাতা ছুঁয়ে আদরে সোহাগে বলেছিল ভালোবাসি।
কুয়াশা কুয়াশা মন খারাপেরা ভিড় করে আশেপাশে;
উদাস বিকেলে সময়ের আগে তমসা ঘনায়ে আসে।
ঝুপঝুপ করে বৃষ্টি ঝাঁপায় অন্ধকারের কোলে;
শঙ্খের ধ্বনি গোধূলির বেলা মন্দ্রিত করে তোলে।
আঁধারের গায়ে মিশে যায় দিন; রাত্রির চরাচরে —
মুখরিত হয় ঝিল্লির গান পল্লীর ঘরে-ঘরে।

মিনু

অভীক ঘোষ,
এস.এ.সি.টি., ইংরাজি বিভাগ

বাড়ির পাশেই বাঁশতলাতে
ছোট্ট মিনুর ঘর,
মাটির দাওয়ায় একচিলতে
ছিলোনা আড়ম্বর।
সকাল হলেই মিনুর মায়ের
চলতো ছোটা ছুটি,
বাসন মাজা, কাপড় কাচা
তালপুকুরে জুটি।
তালপুকুলে সাতসকালে
পাড়ার অনেক মেয়ে,
নাইতে যেত গামছা গায়ে,
মলিন মলিন দেহে।
কথায় কথায় উঠতো জমে
তালপুকুরের ঘাট,
কতো মানুষ আসতো যেতো
সকাল, সন্ধ্যা, রাত।

ছোট্ট থেকেই মিনুর আবার
পড়াশুনার শখ,
সেসব নিয়ে মিনুর মায়ের
চলতো বকবক।
ছোট্ট মিনু জানতো ঠিকই
শিক্ষা মানুষ গড়ে,
মিনুর বাবা বাঁশদ্রোনিতে
চটকলে কাজ করে।
অল্প আয়ে টেনে টুনে
দিন চলতো কোনোক্রমে,
শুনছি নাকি চটের কলে
জমকালো মল উঠবে জমে।
তিন প্রাণীতে টানা পোড়েন —
অল্প একটু ভাত,
খাঁচায় আছে পোষা পাখি,
চেল্লায় দিন রাত।

মিনুর তখন সদ্য ষোলো
অল্প বয়স তাতে কি হলো ?
অনেক ভেবে ঠিক করলো
মেলাবে চার হাত,
পড়াশুনা অধ্যবসায়
শিকেই তুলে রাখ ! !
দারিদ্রতার আগল খুলে
মিথ্যে হাঁক ডাক।

বেকারত্বের প্রশ্ন

সৌভাগ্য মিস্ত্রী,
৪র্থ সেমেস্টার, বোটানি বিভাগ (অনার্স)

নিয়মের গতিতে বয়ে চলা আমার নয়তো কোনো নিয়ম,
নিয়মটাকে বদলানো সেটা আমারই অনিয়ম।।
বাস্তুতন্ত্রের সেই কাঠামো বেড়ে চলেছে যত,
সমাজের প্রতিঘাতে বেড়ে উঠেছি অবিরত।।
শান্তনার সেই হাতগুলো আজ পাই না আমি খুঁজে,
চিন্তাগুলো আজ পালিয়ে গেছে নিজের নিজের কাজে।।
প্রতিবাদের মাঝখানে সেই নিজেকে ছুঁড়ে দেওয়া আমি।
ছদ্মনামের পোশাকে আজ হয়েছি কম দামি।।
মুনি চুপ-চাপ, এক নিমেষে যত তীব্র সমাচার
বছর একুশ হতেই বুঝি বেকারত্বের দরবার।।
ভাগ্য সেজে নামে রয়েছে আমার কালিকা মত্ত জীবন,
বিধাতা করেছে গুণ শূণ্য বুঝি, ভয় পাই না তো জীবন্ত মরণ।।
দিনের শেষে প্রশ্নরা সব চোখের সামনে ভাসে,
না জানা সব উত্তরে তারা কেমন জানো হাসে।।
কল্পনা করা সেই বাংলোতে থাকা হয়না তো আমার,
হুড খোলা সেই গাড়িটাতে চড়া হয়না তো আমার।।
প্যাশন থাকা ফোটোগ্রাফিটা করা হয় না তো আমার।।
গিটারটা আজ জড় বস্তু, নতুন সুরে ভাসা হয় না তো আমার।।
বলতে পারেন কী আছে এই সুখের প্রতিকার?

আমি মেয়ে, তাই?

অঙ্কনা সরকার,
৪র্থ সেমেস্টার, দর্শন বিভাগ (অনার্স)

বাবা আমায় খুব ভালোবাসে,
মায়ের আদর? একটু কম মনে হয় তার পাশে।
মা আমাকে ভালোবাসে না, তা নয় ...
তবুও যেন আমার কাছে তুচ্ছ মনে হয়।

ভাইয়ের রেজাল্ট রসে ভরা, 'রসগোল্লার পিস্',
আমার বেলায় শূন্য বাটি, তুই দারুণ করেছিস' ...
শুকনো মুখেই ভিজলো চিঁড়ে, জুটলো না তো জল,
তাতেই খুশী হতেই হলো, হোক না ভালো ফল।

মা..., মেয়ে হয়ে মেয়ের যত্ন নিতে কেন এতো দ্বিধা?
কখনও আবার বলেই ফেলো, কথা উল্টো-সিধা
আড়ালে বসে তখন আমার চোখের কোনে জল,
বিষণ্ণতায় মনটা বলে, 'পৃথিবী ছেড়েই চল'।

কিন্তু না, আমি চলে গেলেই সব হবে না শেষ
যুগ যুগ ধরে আসছে চলে, থাকবে এটার রেশ,
যতই করুক মনটা কেমন,
সমাজ আমার চলছে এমন,
চোখের জলে ভেসে গেলেও মারবে সমাজ ঠেস।

তাইতো শপথ করছি আমি, পাল্টে এটা দিতেই হবে
দেখবে দেশের নারীজাতি, এই ধারাটা বদলে যাবে,
সঙ্গে যদি কেউ না থাকে, বদলে দেব আমিই একা,
সম্মান পাবে সব মেয়েরাই, এই সমাজেই যাবে দেখা।

ব্যথা

অজয় ঋষিদাস,
৪র্থ সেমেস্টার, বাংলা বিভাগ (জেনারেল)

এই পৃথিবীর যা কিছু আপন;
যা কিছু সম্পর্কের বাঁধনে
নিকট থেকে নিকটতর হয়ে যায়,
যার মাঝে নিজের সর্বস্ব দিয়ে দিলেও
হারানোর কোনো ভয় থাকে না;
সেই সম্পর্কগুলি জানিনা কেন ব্যথা দিতে এতো ভালোবাসে।
এই পৃথিবীর নিয়মগুলি
সত্যিই মহান আর বাস্তব!
যার সাথে বিশ্বাসের বন্ধন যত বেশি
যার গভীরে যতই যেতে চাও,
সেই তোমায় তত বেশি ব্যথা দেবে।
জীবনের এই দীর্ঘ পথে নানান ছন্দে চলতে চলতে
খুঁজে পাওয়া ভালোবাসা - বন্ধুত্বের মতন
গভীর সম্পর্কগুলিই যতই কোমল-নিষ্পাপ হোক
এরা একদিন ব্যথা দেবেই।
জানিনা সে ব্যথার ভাষা কেমন হতে পারে;
তবে এটা জানি যে ব্যথার এমন তীব্র যন্ত্রণা —
যদি না পারো সহিতে;
... তবে মুহূর্তের মধ্যেই সবকিছু শেষ।
সেই মুহূর্ত, লেলিহান শিখার উদ্দীপ্ত দাবানলের মতো
জ্বলে উঠবে সকল ভাবনা চিন্তা।
তারপর শুধুই অনুভব করতে হবে —
সবকিছু অন্ধকার . . . . অন্ধকার।

মুক্তি

সাহিন আক্তার কারিকর,
প্রাক্তন ছাত্র, ইতিহাস বিভাগ (অনার্স)

নেই
না থাকাটাই যথেষ্ট ছিল দুজনা'র
ভাবছ
এরপর
ভ্রমণতীর্থ কাহিনী না কি
পৃথিবীর রূপ

বিপর্যস্ত, আড়ালে লুকানো মুখ সবই তার সুখ

একান্ত
তাও তার নই

অভিনয়ের আস্তাবল থেকে
উড়ে যায় পাখি। দোষ নেই। কেউই
ফিরে আসে না, ফিরিয়ে দেয় না উভয়ের বন্ধন মুক্তির ঋণ।

বহুদূর...

রামকৃষ্ণ নায়েক,
প্রাক্তন ছাত্র, ইতিহাস বিভাগ (অনার্স)

এই সন্ধ্যার আকাশ আরো নিঃসঙ্গ করে তোলে পদ্মপাতার উপর বিন্দু বিন্দু জল। ছায়া যুদ্ধের পথ ধরে নেমে
আসে অকাতর ভয়, জানা হয়ে ওঠে না বাবার শেষ শৈশবের দুরন্ত ইচ্ছা।

মা বড্ড ভালোবাসত। আজ তুমি। তবুও এ হৃদয় কেন জল আলপনার আলো আঁধারে মন খারাপের মেঘ ভাসায়।
এই দেখো ভুলে যেতে যেতে বৃষ্টির জলে নৌকা ভাসানো হল না বহুদিন।

স্থির ওই চোখ মায়াবী জ্যোৎস্নায় চোরাবালি। সেখানে ডুবতে দাওনি কখনো। শুধুই শুকনো পাতার মত মরমর করে জ্বলেছে
রক্ত মাংসের হৃদয়।

কারিগর এই মস্ত আঙিনায় দাবা খেলায়।
জানি, ভালোবাসা পাওনি কখনও ঘর ছেড়ে ঘর গড়ে।
ভাঙা আয়নায় মুখ দেখে যত অমঙ্গল ছিল গুটিয়ে এনেছি বাসায়। তার কিছুটা নিয়েছে অংশীদার হয়ে

নিরুপায় আমি। অশনির সংকেত অনির্দিষ্টকালের মন্থর গতি। ছেড়ে যেতে যেতে ছেড়ে গেছে সব ঘাট কোন
কিনারায় উঠি। ধ্বংসের মুখে আমি আমারই দেখতে পায়। কতদূর আর কতদূর গেলে

এই প্রশ্নে ...

এ দৃঢ় অঙ্গীকার। পাল ছেঁড়া তরী। ত্রিভুজ নয় গোলাকার বৃত্তে একদিন হব মুখোমুখি তারপর যত শোক তাপ
শ্লাঘা নিমেষে হবে মাটি। জানি তুমি সেদিনের মতই বলবে

আমরা এভাবেই বাঁচি।

বাবলি তোর জন্যে

রামকৃষ্ণ নায়েক,
প্রাক্তন ছাত্র, ইতিহাস বিভাগ (অনার্স)

বাবলি, তোমার চুলের কাছে অভ্র নাকি বৃষ্টির ফোঁটা?
কেন সারা ঘর জুড়ে অব্যাহতির গন্ধ?
সকালে উঠে দেখি জানলার কাছে মেঘ নেমে এসেছে —
কাল সারারাত জেগে কাটিয়েছি,
সারারাত, ভীষণ এক যন্ত্রণা আমাকে তাড়া করেছে পাগলা কুকুরের মত।

বাবলি, আমি আর সকাল চাই না,
একটা মিশমিশে অন্ধকার আমাকে ঢেকে দিক —
আমি স্বপ্ন দেখে কাটিয়ে দেবো বাকি জীবন।
তোমার বুকের কাছে নাক রেখে যে সন্ধ্যা জয় করেছিল রজনীগন্ধা,
সেই সুবাস এখন বিষ মনে হয়।
আমি সেই বিষাক্ত গন্ধে ডুবে যাচ্ছি —

দেহান্তর

সাহিন আক্তার কারিকর,
প্রাক্তন ছাত্র, ইতিহাস বিভাগ (অনার্স)

সূর্যালোকের ছিটে ফোঁটা নেই
ফু
  ট
    পা
      ত
আধূলির ছড়াছড়ি
খই মুড়ি
        খুটে খুটে খায় কাক

চোর পুলিশের চাঁদ
আঁচলের
        আ
          ড়া
            ল
বাঁচার, বেঁচে থাকার শেষ সম্বল।

অধ্যক্ষ মহাশয়ের স্মরণে

আল-হুদা বিন আজম
স্নাতক, গণিত বিভাগ (২০২১)

সংবাদটি সত্য নাকি কাকতলীয়?
সেইদিন সংবাদটি পাওয়ার পর-
আধ-খাওয়া খাবারের পাত্রটি;
আর শেষ করা হয়ে ওঠেনি!

হঠাৎ করে ঘুরলো মাথা,
টলে উঠলো আমার গা।
আস্তিন যখন ভিজল জলে,
বুঝলাম, জীবন মানে অবজ্ঞা।

সেদিন রজনীগন্ধা ভাললাগেনি,
চোখ জ্বলেছিল ধুনোর ধোঁয়ায়।
সব হারালেও ছিলনা ক্ষতি,
চেয়েছিলাম, মৃত্যু কেবল মিথ্যে হোক।

দু-ফোটা নোনা জল গেল শুকিয়ে,
তবু, হৃদয়ে আপনি গেলেন রয়ে।।

প্রিয়

কৌশিক রঞ্জিত
স্নাতক, গণিত বিভাগ (২০২২)

জানো প্রিয়,
আমি চাই না মাঝপথে তোমার হাতটা ছেড়ে দিতে।
আমি শরৎচন্দ্রের দেবদাস হতে চাই না,
আমি চাই না তুমিও আমার চোখের সম্মুখে অন্য কারো হয়ে যাও।

জানো প্রিয়,
আমি হুমায়ুন আহমেদ এর হিমুও হতে পারবো না,
এক অজানা অপেক্ষায় তোমায় আমি বসিয়ে রাখতে পারবো না।
আমি শীর্ষেন্দুর হেমাঙ্গও হতে পারবো না,
এক জটিল প্রেম যন্ত্রণায় তোমায় ভোগাতে পারবো না।

তবে আমি আজকের ''তুমি''টা হতে পারবো।
বিনা শর্তে, বিনা দ্বিধায় তোমায় নিজের কাছে আগলে রাখতে পারবো।
তোমায় বেশি অপেক্ষা করাবো না গো, তোমার চোখের জলে আকাশ ভিজতে দিবো না।
তোমার হাতে হাত রেখে আমি গল্পে ডুবে যাবো,
কখনো কালজয়ী উপন্যাস হবো আবার কখনো প্রিয় কবিতা।
তবুও তোমায় হারাতে পারবো না।
একাবিংশ শতাব্দীতে আমি এমন কবি হবো,
যেখানে তুমি হবে আমার কালজয়ী প্রেমের উপন্যাস।

কল্পনা

আকাশ মণ্ডল
ষষ্ঠ সেমেস্টার, গণিত বিভাগ

ঈশান কোণে উঠলো মেঘ, আসল পবন ধেয়ে।
নীল নীলিমা কাজল পেল মেঘের ছোঁয়া পেয়ে।।

হঠাৎ হাওয়া থমকে গেল, আসল ধেয়ে বারি।
আকাশ থেকে আসল নেমে ভ্রমণরত পরী।।

উষ্ণবায়ু উর্ধে গেল মুখটি করে লাল।
শীতল এল স্বপ্ন নিয়ে, মাতৃরূপে বুলিয়ে দিতে গাল।।

এবার বিশ্ব পড়বে ঘুমিয়ে আমরা উঠব গেয়ে।
গলায় মালা পরবো মোরা তোমার আশীষ পেয়ে।।

সবাই যখন পড়বে ঘুমাইয়া আমরা গাইবো গান।
শীতল মাঝে শীতল গানের পরশ করবো দান।।

আমি ডাস্টবিনের আর্তনাদ

আমিরুল খান
স্নাতক, গণিত বিভাগ (২০২২)

মা তুমি জানতে আমি ছেলে ছিলাম নাকি মেয়ে?
জানতে আমার মুখশ্রীর গঠন?
জানতে তুমি আমার বয়স কত ছিলো তখন?

আমি ডাস্টবিনের অনাকাঙ্ক্ষিত বর্জ্য প্রাণী,
জঠরে ধারণ করে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছো
রক্তের নিশানি।
তোমার প্রতিশ্রুতির ছেলেখেলায় নিষ্পাপ ছিলাম,
মা আমি কোন অজুহাতে হত্যা হলাম?

কালিমাময় চরিত্রের ভয়ে রুদ্ধশ্বাসে হাত ভিজিয়েছো নিষ্পাপের রক্তে।
শারীরিক সুখের জন্য একটি জীবনকে ফেলে দিয়েছো ঘৃণাভরে।
কর্দমায় সমাজে ভদ্রতার মুখোশধারী না হয়ে যদি হতে তুমি
এক কুচনী,
তবে হয়তো আমার কষ্টকাতর আর্তনাদ ডাস্টবিনে প্রতিধ্বনিত হতোনা।

নীরব পৃথিবী

শুভম গাইন
ষষ্ঠ সেমেস্টার, গণিত বিভাগ

পাখি শুনতে কি পাচ্ছো তুমি.. ?
পাখি .. ও পাখি.. পাখি..।।

নেই..
আমার সে পাখি আজ আর নেই..!
গেছে সে উড়ে
সবাইকে ছেড়ে
আর না ফেরার আকাশে...।

দোষ কি ছিল বল
আমার পাখিটির... ?
বেশ তো হাসছিল, খেলছিল।
তবে কেনো বিধঁলো...
তার বক্ষেতে তির... ?

দাও উত্তর
খেকো না চুপ বোকা পৃথিবী..!

এভাবে আর কতদিন
চুপ করে সইবে এই রিক্ত, অমানবিক নৃশংস নির্যাতন..।

সাড়া দাও, জোট হও
থেকো না আর অসাড় হয়ে
ঐ দানবের ভয়ে।
নইলে যে সে একদিন বধবে তোমায়ও।

ওঠো, জাগো, লড়ো
তুমিই পারবে ওই দানবেরে করতে রোধ।

মানুষ যেন সস্তা

সেখ ইরফান করিম
স্নাতক, গণিত বিভাগ (২০২১)

অদ্ভুত দুনিয়া, মানুষগুলো আজব,
রঙ বদলানো তাদের স্বভাব।

কেউ খোঁজে ডাস্টবিন, খেতে না পেরে,
কেউ আবার খিদের জ্বালায় ঘোরে।

কেউ কারো কাছে মানে না হার,
মৃত্যু ভয় ভুলে যায়, টাকার অহংকার।

অসৎ টাকা, সুখের আশা, কেউ মহল বানায়,
কেউ আবার ফুটপাতকেই সঙ্গী বানায়।

বাড়িয়ে দেওয়া হাত কেউ ছেড়ে পালায়,
কেউ সেই হাত ধরেই স্বপ্ন সাজায়।

অনেক মানুষ দেখেছি আমি,
দেখেছি তাদের মনুষ্যত্বে অভাব,
আমার ভিতরের শয়তানও
মুখ ঢেকে যায় লজ্জায়।।

Realization of Reality

Poulami Das
5th Semester, English Honours

Children aren't social now
Cause they live in social media —
Children are dying now
For frustration and polluted area.
Competition is everywhere
From school to businesses,
We forget to live our lives
To be the winner of these races.
Web's getting closer to us
To create problems;
Oh! We've lost in the world of depression
Where humanity defeated by selfishness
We should save our childhood,
Kill the evils to make the world pure
Awake, awake, it's the time
Don't steep any more.

When the void place of high,
Atmosphere of the void sky.
Fill with the disastrous troops,
That came here by monstrous groups.

I on the earth beneath the cloud,
In the memories of the doubt.
That came across the happy ocean,
To fill up life of men with obstruction.

When she was beside me with hope,
And I was busy to be her cope.
Happy ocean's troops throw rain,
All the humans busy life become vain.

She through the soft way throw cap,
On the man who wants to be her map.
I become lashfull back of Solomon's mishap.

The troops of disaster become, mild
At the end of their disastrous field.
The atmosphere become dark and cold,
And nature in a pose of confuse, hold.

I am in a mind, that defeat cooker
With the thoughts that push toward looser.
The drop of rain that at last cease,
Flowing on the ground in search of seas.

Seeing her beside trying to touch,
But the hallucination end without touch.
The nature too is mourning but clean
And everyone trying to come out from scene.

I with the good-bad thoughts of Angel
Trying to move forward in mind's jail.
As Solomon did after his torturous tell.

Me to myself

Poulami Das
5th Semester, English Honours

You! Yes you the reason,
I broke but arise like hone —
You're the only season;
For why I live from aeon.
When the nights come in horror,
My heartbeat stops,
Only stand in front of the mirror
As I see myself, my true boss
From everything my dreams are bigger
So, my love is only me.

সদর দরজা

অরুন্ধতী মিশ্র
এস.এ.সি.টি., উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ

বিহার থেকে অনেকদিন পর রাজু নিজের বাড়ি এসেছে, সাথে রিতা ও রাজুর দুই ছেলে। রাজু আর রিতার বিয়ে হয় প্রায় এগার বছর। বিহারে দুজনেই কর্মরত। রাজু রেলওয়ে গার্ড আর রিতা একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে চাকরি করে। ছেলে দুটি যমজ। মাত্র সাত বছর বয়স হলো। তবে খুব শান্ত, কোনো ঝামেলা নেই ওদের নিয়ে। রাজু আদর করে ওদের বড় আর ছোট ডাকে। রিতারা এই বাড়ি এলো প্রায় ছয় বছর পর। শ্বশুর মশাই মারা যাবার পর ওরা এখানে এসেছিল,তখন অবশ্য ছেলেরা খুব ছোট। তবে এবার এসেছে একদম অন্য কারণে। রাজুর মা মানে রিতার শাশুড়ী বীণাপানি দেবীর বয়স হয়েছে। প্রায় আশি হতে চললো। রাজু ওনার অষ্টম সন্তান। বাকিরা সবাই যে যার মত সারা বিশ্বে ছড়িয়ে আছে। নিজেদের মত নিজেরা তারা তাদের কাজ ও সংসার নিয়ে ব্যস্ত। কেবল কাছে থাকে রাজুর দুই দিদি। তারা পাশের পাড়ায় থাকে, সেখানে বিয়ে হয়। বাকি দাদারা তিনজন,আরো দুই দিদি ও এক ভাই সবাই দূরে থাকে। বীণাপানি দেবীর সব মিলিয়ে মোট নয় সন্তান। কিন্তু সবাই সবার খোঁজ রাখে আর সবার মধ্যে সদ্ভাব রয়েছে। সবাই এই গ্রামের পুরোনো বাড়ি থেকে নিজেদের মা কে তাদের কাছে নিয়ে যেতে চায়। কিন্তু তাদের মা এই ভিটে ছেড়ে যেতে একদম রাজি নয়। স্বামীর ভিটে ত্যাগ করে অন্য কোথাও কোনোদিন যাবেন না বলে মনস্থির করে রেখেছেন উনি। কারোর কথায় কান দেন না তাই। সন্তানরা যে যাই বলুক,উনি শোনেন না ।দুজন কর্মচারী নিয়ে এই বাড়িতে বাস করছেন দীর্ঘদিন হলো। সব ছেলে মেয়েরা তাই হলে প্রায় ছেড়েই দিয়েছে। তবুও এবার রাজুরা এসেছে তাদের মা কে বুঝিয়ে যদি একবার নিজেদের কাছে নিয়ে যেতে পারে। রিতাও বলেছে, চলো দেখি একবার চেষ্টা করে যদি জোর করে বা বুঝিয়ে সুঝিয়ে একবার মা কে নিয়ে আসতে পারি আমাদের বিহারের বাড়িতে। রাজু বলে, তাহলে তো ভালই হয়, আমরা সবাই একটু চিন্তামুক্ত হই।

বীণাপানি কে দুজনে মিলে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করে কিন্তু বারে বারে বলা সত্ত্বেও ওনার মুখে একই কথা, "আমি কি করে সব ছেড়ে তোমাদের সাথে চলে যাই? এখানে তোমাদের পিতৃপুরুষরা থাকেন! " , " তাদের ভিটে ছেড়ে কি করে অন্য জায়গায় বাস করবো ? " রাজু বলে, "এটা কোনো কথা মা?" উনি বলেন, "না, না, এটা হয় না, যাওয়া হবে না আমার।"

অনেক চেষ্টা করেও রাজু তাদের মা কে রাজি করাতে পারলে না। রাত হলো। খাওয়াদাওয়ার পর সবাই শোবার ব্যবস্থা করতে লাগলো। দুই ছেলে নিয়ে রাজু একটু তাড়াতাড়ি বিছানায় শুয়ে পড়লো। সবাই আজ একটু ক্লান্ত। তবে রিতা তখন বীণাপানির পাশে ওনার বিছানায় বসে শেষবারের মত ওনাকে বোঝাতে বসলো। সামনের দরজা টা তখনও খোলা। বীণাপানি দেবী তার প্রিয় কর্মচারী গণেশ কে ডাকাডাকি করতে লাগলেন। "গণেশ, ও গণেশ, কি রে সদর দরজা টা বন্ধ করিস নি কেনো এখনও?" কোনো উত্তর এলো না গণেশের। উনি আবার ডাকলেন, বললেন, "সদর দরজা দিয়ে তারপরে ঘুমোস বুঝলি, ডাসা টা ভালো করে দিস।" গণেশ এলো না, । কোনো শব্দ ও নেই। উনি আবার বললেন,"তুই কি ঘুমিয়ে কাঁদা হলি না কি? মহামুশকিল হলো দেখি।" রিতা তখনও বসে। এবার বলল, "আমি দিয়ে আসছি মা।" বীণাপানি দেবী বললেন,"বৌমা তুমি পারবে না, খুব শক্ত ডাসা।" রিতা বলল, "পারবো আমি।" কিন্তু বীণাপানি দেবী আবারও ডাকতে থাকে, "ও গণেশ, ও গণেশ!"

এখন রাত প্রায় সাড়ে দশ টা। রিতাও খুব ক্লান্ত। আর দেরি না করে তাই শাশুড়ী কে বলে, "মা, আগামীকাল কিছুদিনের জন্য হলেও আমরা আপনাকে বিহারে আমাদের ওখানে নিয়ে যাবো সঙ্গে করে। কিছুদিন পরে না হয় আবার দিয়ে যাবে আপনাকে এখানে আপনার ছেলে। আপনার কোনো কথা আর শুনবো না আমরা।" বীণাপানি দেবী একটু মুচকি হাসলেন। রিতা বলল,"আপনার ছেলে খুব কষ্ট পাবে তা না হলে।" সব শুনে বীণাপাণি দেবী বললেন, "শোনো, আমার যাবার কি কোনো উপায় আছে? তোমাদের বলে বোঝাতে পারছি না। আসলে আমার যাবার কোনো উপায় নেই।" রিতা আর কথা বাড়ায় না। বলে ,"আপনি ঘুমোন, আমি সদর দরজা দিয়ে শুয়ে পড়ছি।"

রিতা দুটো ঘর পেরিয়ে বাইরের বারান্দা পার করে হন্‌হন্‌ করে এগিয়ে যায় সদর দরজার দিকে। দরজার দিকে তাকাতেই দেখে রাজু হাতে ডাসা নিয়ে পেছন ফিরে সদর দরজায় ডাসা লাগাচ্ছে। বারান্দায় তখনও আলো টা জ্বলছে। রিতা উঠোন থেকে স্পষ্ট রাজু কে দেখতে পায়। কেবল পেছনটা। কিন্তু রিতার কেমন যেনো একটু লাগে। রাজু কে আজ একটু বেশি লম্বা মনে হয় রিতার। রিতা কোনো কথা বলে না। ফিরে আসে ঘরে। ঘরের দরজা খোলা রেখে বিছানায় শুতে আসে। একি!, বিছানায় তো দুই ছেলে নিয়ে রাজু শুয়ে। ঘুমিয়ে আছে সবাই। তবে যে এই মাত্র সদরে রাজু কে দেখলো রিতা। রিতা মনে মনে ভাবে, কি দেখলাম তবে আমি!! এটা ঠিক কি হলো? এই অল্প সময়ে রাজু কখন ফিরে এসে আবার ঘুমিয়ে পড়ল! ব্যাপার টা কেমন যেনো একটু অস্বাভাবিক লাগছে।তবে এত ক্লান্তি শরীরে যে রিতা ভাবলো যা দেখেছি, দেখেছি। বাকি টা আগামীকাল দেখবো। এখন তো শুই।

সকাল হতেই রিতা রাজু কে প্রশ্ন করলো, গত কাল রাতে তুমি ঘুম থেকে উঠেছিলে সদর দরজা দিতে? রাজু হা করে তাকিয়ে রইলো বেশ কিছুক্ষন রিতার দিকে। বললো, "আমি তো কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, আমি তো উঠিনি আর।" রিতা এবার ভয় পেয়ে গেলো। রাজু কে কিছু না বলে সোজা শাশুড়ির কাছে দৌড় দিল। গিয়ে সব ঘটনা বিস্তারিত জানালো। সব শুনে বীণাপানি দেবী মুচকি হেসে বললেন, "রাজুর জ্যাঠামশাই একদম রাজুর মত দেখতে ছিলেন। তুমি ওনাকে দেখো নি। তোমাদের বিয়ের চার বছর আগেই উনি মারা গেছেন। কেবল আরেকটু বেশি লম্বা ছিলেন।"রিতা বলল, "কি!!" আর কোনো কথা তখন রিতার গলা দিয়ে বেরোচ্ছিল না। ভয়ে হাত ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে তখন।একটু সামলে রিতা বললো, "মা, আপনি সব জানতেন, মানে সব জানেন। "বীণাপানি দেবী বললেন, "আমি তো সব জানি, আর এও জানি যে আমার এখান থেকে কোথাও যাবার উপায় নেই, কারণ ওনারা কেউ চান না যে আমি এই ভিটে ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাই। তাই তো সদর দরজা ওনারা পাহারা দেন। তোমাকে বললাম না, আমার কোথাও যাবার উপায় নেই, কি বুঝলে বৌমা।"

স্ত্রৈণ

ড. জয়ন্ত মিস্ত্রী
অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ

সওদাগরী অফিসের বড়বাবু। অফিসে আমার গুরুত্ব সবার উপরে। তাই ব'লে বাড়িতে? এখানে আমার কাজ গিন্নি শপিংয়ে বেরোলে গেটে তালা বন্ধ করা। শপিং থেকে ফিরলে দৌড়ে এসে তালা খোলা। মুদির বাজারে কিছু ফেলে এলে সেটা নিতে ছোটা। - এ আর নতুন কী? বাবা এখন নেই, দাদাকে বৌদির শাড়ি মেলতে দেখে কসবায় রাত গত না করেই তিনি ফিরেছিলেন মৌরি গ্রামে। অবাক মাকে চুপি চুপি বলেছিলেন আজকালকার ছেলেরা সব স্ত্রৈণ। ভারিক্কি মেজাজের এ সমস্ত লোক আর দেখা যায় না। এমন মায়েরাও বা কোথায়? তখন মায়েদের মুখে অনুযোগ আপত্তির আড়ালে প্রকাশ পেতো কড়া স্বামীর প্রতি পক্ষপাত।

যুগ বদলেছে। একসময়ের বাস্তব অন্য সময় গল্পের মত শোনায়; আর যা একদা গল্প ছিল তাকে বিস্ময়কর বর্তমানের সঙ্গে তুলনায় বড় ফিকে লাগে। আবার কখনো কখনো ঘটনা বলে গেলেই গল্প বলা হয়।

সেদিন খুব কুয়াশা পড়েছিল। দূরের নারকেল গাছ আর সুপারি গাছের মাথা গুলো ঝাঁকড়া চুলে গুঁড়ো কুয়াশার তুলো জড়িয়ে দাঁড়িয়েছিল। ধুলোর কুয়াশা উপর থেকে নামছিল। বুলবুলি আর ছাতারের দল স্লাইডিং গ্লাসে নিজের চেহারা দেখে ঠোকরাতে থাকে, আমাকে দেখে রণে ভঙ্গ দিল তারা।

ঠাণ্ডা নেই । নিচের সিঁড়ি থেকে উপরের ছাদ সবটাই পরিষ্কার, যেখানে খুশি বসা যায়। বিভিন্ন ভঙ্গিতে বসলে ব্যায়ামও হয়, পড়াও হয়। সবচাইতে প্রিয় পাঁচতলার উপরটা। সেখানে কংক্রিটের ঢালাই বেঞ্চ। তার সামনে মেঝে সংলগ্ন ধ্যানপিড়ি , চার দিক রেলিং দেওয়া। রেলিং এর উপরটা সবুজ রঙের। মাঝখানের ছাঁচে ঢালা পিলারগুলো ডিজাইন করা; তাতে লাল রং । সেই রং মেঝের উপর টানা, রোলার দিয়ে। খোলা ছাদের যে অমসৃণতা, তা এই রঙের আচ্ছাদনে ঢাকা পড়েছে। এখন একটা কাঁথা নিলেই ব্যাস। শীতের কাঁথা আর বর্ষার ছাতা দুই- ই দরকার হয় এখানে। হাওয়া আর বৃষ্টির কারণে। ছুটির দিনে একশ সিঁড়ি ভেঙে ওপরে ওঠা আর নামা দিনে দশবার করতেই হয়। এই বাধ্যকতা হার্টের পক্ষে ব্যায়াম মনে করলে লিফ্ট না থাকার কষ্ট মালুম হয় না।

তাই বলে এ বাড়িতে অশান্তির কারণ ঘটবে না এমন মাথার দিব্যি কে দিয়েছে? আর দিব্যি দিলে রাখেই বা কে?

খুব ভোরে ওঠার অভ্যাস। তখন সূর্য উঠতে ঘন্টা দুয়েক বাকি। ব্রাহ্ম মুহূর্ত কেটে গেছে, এখন ঘরের পড়াশুনো সেরে বাইরে যাওয়ার সময়। বাইরে মানে উপরের ছাদে। দৃষ্টি নাভিমূল থেকে নয়নে।

নিচের তলার ঘুম ভদ্র সমাজের নিয়মে ভাঙে। ভোর রাতে উঠে 'মানুষ জ্বালানো' তিনি পছন্দ করেন না। রাত দুপুরে বই হাতে ভূতের মতো 'বিড়বিড় করা' তাঁর কাছে অসহ্য। তিনি বলেন ''স্পষ্ট কথায় কষ্ট নেই।'' উপরের নিয়ম নিচে চলবে না -- নিচের ব্যাপারটাই আলাদা!

খাওয়া দাওয়া আর গল্প গাছা। অন্য কিছু নয়। পড়তে হলে উপরে যাও, দোল খাও, ইজি চেয়ারে ঝিমোও কেউ বাধা দেবে না। কিন্তু এই সীমায় কোন মাতব্বরি চলবে না এটা সম্পূর্ণ গৃহকর্ত্রীর। এই deal না মেনে উপায় নেই ।

ছুটির সকাল বেলা। মাথা পশ্চিমী সাহিত্যতত্ত্ব আলোচনায় মগ্ন, এমন সময় হরিনাম সংকীর্তন ! খোল-করতাল আর কয়েকজন পুরুষের তালিম না দেওয়া কণ্ঠ ! পরস্পরের সঙ্গত করছে তারস্বরে। উপদ্রবের মতো কানে আসছে। কিন্তু মনে তখন প্লেটো শিষ্য অ্যারিস্টটলের ৭৩ পাতার একখানা বই ।

২০০০ বছর ধরে কীভাবে একটা বই বেঁচে থাকতে পারে? কী আছে সেই 'কাব্য নির্মাণ কলা'তে --এইসব ভাবতে ভাবতে ভ্রু কুঁচকালেও চোখ উঠছে না বইয়ের পাতা থেকে। ইনগ্রাম বাইওয়াটার ভাগ্যিস ইংরেজিতে বইটা অনুবাদ করেছিলেন !

হঠাৎ একই গানের মধ্যে একটা করুণ মিহি সুর মনোযোগকে সুঁচের মত বিঁধিয়ে দিচ্ছে। অনেকটা বিরক্তি আর কান্না মিশে গিয়ে.... কী এমন হলো ? কোথায় হলো ? নীচের ঘুম ভাঙেনি তো?!

আটটা বাজতে এখনো তো বাকি; কিছুই বলা যায় না হাতের বইটি বন্ধ করার আর সময় নেই ওইভাবে ছুটতে হবে । নিচে রাতের ঘুম ভেঙেছে। ধর্ম এসে ঘুমের কড়া নেড়েছে!

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে শুনলাম : ''এই মানুষটা থাকলে জ্বালা, না থাকলেও জ্বালা ! বাড়ির মধ্যে 'নাম' হবে তার কি উপায় আছে ? জীবনের এত পাপ এত সহজে মুক্তি হবে?'' বাইরে বৈষ্ণবেরা ১৬ নাম ৩২ অক্ষরে মাতোয়ারা। ভিক্ষার ঝুলি হাতে আগের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো; এবার আমাদের দান করার সুযোগ। কিন্তু বাইরের দরজা বন্ধ। খোলার উপায় নেই ঠাকুরের নাম দ্বার প্রান্ত থেকে ফিরে যাচ্ছে-- এর চাইতে মন্দ কপাল আর কী হতে পারে?

পুণ্য লাভের সুযোগ হাতছাড়া হচ্ছে বলে কষ্টে তাঁর গলা কাঁপছে !

কোথায় চাবি? প্যান্টের পকেটে! কাল সন্ধ্যের পর কালো প্যান্ট পরেছিলাম। কই? নেই তো! তাহলে কোথায় গেল? ওদিকে হুংকার উঠছে

'আমার চাবিটা কোথায়? জানি পাওয়া যাবে না। একটা জিনিস যদি সময় মত পাওয়া যায় !'

ওদের ঘুমের মধ্যে আমায় বেরিয়ে পড়তে হয় বলে আমার ব্যাগের মধ্যে দ্বিতীয় সেট থাকে; কিন্তু এ তালা তো পাল্টানো! ভয়ে গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। কীর্তনের দল তো চলেই যাবে! ঠিক জায়গায় চাবি যদি থাকতো তবে গিন্নি সেটা তো দেখতে পেতো, তাই দেখা জায়গায় পাক খেতে লাগলাম। কীর্তনের দল তো এগিয়ে আসছে... খুব কাছেই এসে গেল!

অবশেষে মরিয়া হয়ে গেলাম সেই হুকটার নিচে। একি! দেখলাম গিন্নির ঘরে দরজার পিছনে নির্দিষ্ট চাবির হুকে চাবিটা ঝুলছে! বের করেই খুলে দিলাম।

টাকা হাতেই ছিল। গিন্নি বৈষ্ণবের হাতে পৌঁছে দিতে পেরে খুশি হল। আমিও শান্তি পেলাম। উপরে উঠতে উঠতে বুকের মধ্যে শুনতে পেলাম "এটাও একটা স্ত্রৈণ"। বলেছিলেন একজন আজ তাঁর ইহলোকের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। আমার ছেলে অবশ্য বলে ভদ্রলোকেরা স্ত্রৈণ-ই হয়ে থাকে। আমি মনে মনে বলি "নইলে সমাজ সংসার রসাতলে যায়"। তাছাড়া বিদ্বান চিরকাল বুদ্ধির কাছে হারে! কথা বললে কী হতো সব ভদ্র লোকের মতো আমারও জানা ছিল। বলতো 'চাবিটা রাখো কোনদিন ঠিক জায়গায়? আজ না হয় ভুল করে ঠিক করেছো। তা আমি কী করে ভাববো, যে তোমার মত মানুষ ঠিক জায়গায় চাবিটা রাখবে?'

কোন কথা বললাম না; সিঁড়িতে পা দিয়ে অনুভব করলাম 'স্ত্রৈণ' হওয়াটা অধঃপতন নয় শান্তি বজায় রাখার উপায়, নতুন কালের অভ্যাস।

মায়াঙ্ক

শৌভিক বিশ্বাস,
৩য় সেমেস্টার

হঠাৎ আমরা একদিন বেরিয়ে পড়লাম কোথায় তা আমরা কেউই জানি না। আমি যাব আর আমার সঙ্গে চার বন্ধু যাবে। এই শহুরে জীবন থেকে একটু মুক্তি পাওয়ার লক্ষ্যে। তাই কাউকে কিছু না বলেই রওনা দিলাম। সঙ্গে জলের বোতল ছাড়া আর কিছুই নিলাম না। অনেকদিন আগে কাকার কাছে একটা গল্প শুনেছিলাম। তবে সেটি সত্য কিনা তা নিয়ে মনে সংশয় ছিল। সেই সংশয়টা এবার দূর করা দরকার। স্থানটির নাম মায়াঙ্কপুর। নামটি ছিল বেশ রহস্যজনক। যাই হোক আমরা বেরিয়ে পড়লাম অজানা স্থানের উদ্দেশ্যে। আমরা হাঁটতে শুরু করলাম হাঁটতে হাঁটতে অন্ধকার হয়ে গেল। জঙ্গলটা ক্রমেই চওড়া হতে শুরু করল। নানা জীবজন্তুর শব্দ আমাদের কানে আসতে লাগল। বনে যেন একটু শীঘ্রই সূর্য অস্তমিত হয়। এরপর চারবন্ধুর মধ্যে একজনের প্রচন্ড খিদে পেয়ে গেল। তারা ভাবতে লাগল খাবার কোথা থেকে আনা যায়, তখনই একটি ঝোপের ধার থেকে একটি মেয়ে উপস্থিত হল। মেয়েটির বয়স দেখে মনে হল তেরো বা পনেরো হবে। তবে দেখে মনে হল সে অপুষ্টিতে ভুগছে। মেয়েটি তাদের কিছু ফল দিল খাওয়ার জন্য। ফলগুলি দিয়েই সে পালিয়ে গেল কিছু না বলেই। ফলাহারের পর তারা আবার হাটতে শুরু করল। রক্ষে এইটুকু যে তখন ছিল পূর্ণিমা। বনের মধ্যে চাঁদরে আলোয় এক মায়ামুগ্ধকর পরিবেশ সৃষ্টি হল, যেটি ছিল স্নিগ্ধ ও শান্ত। তারা একটি স্থানে বসল এবং তারা তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হল। হঠাৎই তাদের কানে একটি মেয়ের নূপুরের আওয়াজ এল, প্রথমে তারা এটাকে গুরুত্ব দিল না। তারা মনে করল মনের ভুল। তবে এর খানিক বাদেই তারা আবার সেই একই শব্দ শুনল। তারা সেটি দেখতে সেই স্থানে গেল এবং দেখল সেই মেয়েটি যে তাদেরকে ফল দিয়েছিল। মেয়েটি তাদের দিকে একটানা গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। আমরা তাকে ডাকলাম — 'ও মেয়ে কে তুমি, তোমার নাম কী, এই গভীর অরণ্যেই বা কী করছ?' তবে মেয়েটি কোনো উত্তর দিল না। তাকে আবার জিজ্ঞাসা করা হলে সে শুধুই এই টুকুই বলল যে, আমার নাম মায়াঙ্ক। নামটি শুনে তাদের মধ্যে সন্দেহের সৃষ্টি হল। মেয়েটি আর কিছু না বলেই সেখান থেকে চলে গেল। চারবন্ধু আবার তারা এক জায়গায় ফিরে এল। পরের দিন ভোরে তারা আবার হাঁটা শুরু করল। এবার তাদের কাছে জল ফুরিয়ে এল। তাদের তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে আসতে লাগল। তারা একটি পরিত্যক্ত কুয়ো দেখতে পেল, তারা মনে করল হয়তো একদা এখানে জনবসতি ছিল। এই ভেবে তারা কুয়ো থেকে জল খেতে গেল, তবে যেই জল খাওয়ার চেষ্টা করল তখনই কুয়োর জলেও মেয়েটির ছায়া দেখতে পেল। তারা অবাক হয়ে গেল আর বলল — 'তুমি এখানে কী করছ?' মেয়েটি তখন উত্তর দেয়, 'তুমি কি তৃষ্ণার্ত?' ছেলেটি বলল, হ্যাঁ। তখন মেয়েটি একটি ঘটিতে করে জল দিল, তাদের তখন তৃষ্ণায় প্রাণ বেরিয়ে যাওয়ার মতন অবস্থা, তাই তারা দেরী না করে জল পান করল। তারা তাকে ঘটিটি ফিরিয়ে দিল এবং সে কোনো কথা না বলে সেখান থেকে চলে গেল। তাদের মেয়েটিকে খুব রহস্যজনক বলে মনে হল। যাই হোক তারা আবার যাত্রা শুরু করল। এই বারে প্রায় ত্রিশ মাইল পথ তাদের অতিক্রান্ত হয়ে গেল। ক্রমে যেন জঙ্গলটি শেষ হতে লাগল। চারদিক উন্মুক্ত ও পরিস্কার হয়ে গেল এবং একটি ফাঁকা সুবৃহৎ মঠে এসে উপস্থিত হল। তবে এই যাত্রাপথে জলপান করার পর থেকে তাদের সঙ্গে ওই রহস্যাবৃত মেয়েটির দেখা হল না, এই কথাটাই তারা মনে মনে ভাবতে লাগল। মাঠ দিয়ে চলতে চলতে হঠাৎই তাদের ট্রেন লাইন চোখে পড়ল। তারা সবাই বলতে লাগল অনেকতো অভিযান হল এবার বাড়ি ফেরার পালা। এখন এতটুকুই যথেষ্ট পরে আবার অন্য অভিযানে বেরবো। তারা রেল লাইন বরাবর হাঁটতে হাঁটতে একটি স্টেশন দেখতে পেল, যেটি ছিল নির্জন ও জনমানব শূন্য। কেবল রেলমাস্টার ছাড়া, আর কেউ ছিল না। আশ্চর্যজনক ভাবে রেল স্টেশনটির নাম ছিল মায়াঙ্ক। তারা স্টেশন পৌঁছালো আর ট্রেন আসার অপেক্ষা করতে লাগল। বলতে বলতে ট্রেন স্টেশনে এসে উপস্থিত হল এবং তারা ট্রেনে উঠে বসল। যখন ট্রেনটি আস্তে আস্তে চলতে শুরু করল, তখনই তারা সেই মেয়েটিকে দেখতে পেল এবং তারা অবাক হয়ে গেল। কারণ মেয়েটি তাদেরকে উদ্দেশ্য করে হাত নাড়াতে লাগল। এবং সবশেষে মেয়েটি বলল — ''আবার এসো বন্ধু, আবার দেখা হবে'' এই বলে মেয়েটি তাদেরকে দেখতে থাকল এবং তাদেরকে উদ্দেশ্য করে হাত নাড়াতেই থাকল।

মুক্তি

পূর্ণিমা ভঞ্জ,
৩য় সেমেস্টার, বাংলা (এম.এ.)

সকাল থেকেই যেনো আকাশের মন ভার। আজ আর সূর্য ওঠেনি। মেঘ করে আছে। যখন তখন ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি পড়তে পারে। সোনাগাছির (নামটি ফেসবুকের একজন লেখকের লেখা থেকে সংগৃহীত) চামেলী বাইয়ের ছোট্ট কুঠুরিতে আজ যেনো জমায়েত হচ্ছে সদ্য জাত এক শিশু কন্যাকে ঘিরে। চামেলী বাই এর কন্যার মা। কিন্তু বাবা কে সেটা চামেলীবাই নিজেও জানে না।

চামেলী বাই যখন ক্লাস টেনে পড়ে তখনই পাড়ার এক বিশু নামক ছেলের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বাবা মায়ের দেওয়া নাম অন্নপূর্ণা। বিশুর সঙ্গে সম্পর্ক হওয়ার পর সে বিশুকে জানিয়েছিল চামেলী ফুল তার খুব পছন্দের। ভালোবেসে বিশু তাকে চামেলী নামে সেই থেকে ডাকতে শুরু করে। বিশুর সঙ্গে সে সম্পর্ক অন্নপূর্ণার বাড়ি থেকে কেউই মেনে নেইনি। তাই বিশুর হাত ধরে পালিয়ে আসে সে কলকাতাতে। তারপর বিশু কিছুদিন একটা ভাড়া বাড়িতে রেখেছিল। কিছুদিন পর ভাড়া দেওয়ার আর তার পক্ষে সম্ভব নয় বলে সে জানায় চামেলীকে এবং বলে তার পরিচিত একজন মাসীর বাড়ি এ শহরেই সেখানেই সে রেখে আসবে তাকে, কথা মত কাজও করে বিশু। তাকে রেখে যায় এই অন্ধকার জগতের একজনের কাছে। নাম তার চম্পা। বেশ কিছুদিন একটা ঘরের ভিতরে ছিল। বাইরে সেভাবে বের হতো না চামেলী। একদিন ঘরের ভিতর সে বসে আছে হঠাৎই একজন অচেনা পুরুষ তার ঘরের প্রবেশ করে এবং তাকে নোংরা ভাবে ছুঁতে চেষ্টা করে। ভয় পেয়ে যায় চামেলী চিৎকার করতে থাকে। তার চিৎকারে পাশের ঘরগুলো থেকে ছুটে আসে বেশ কয়েকটা মহিলা সঙ্গে ছুটে আসে চম্পা মাসীও। চামেলী চম্পা মাসীকে সবটা বললে সে বলে এ জায়গায় থাকতে হলে তাকে এমন অনেক কিছুই সহ্য করতে হবে। কারণ তার স্বামী তাকে এই দেহ ব্যবসার কাজে নামিয়ে দিয়েছে। তার বিনিময়ে সে মোটা অঙ্কের টাকা ও নিয়েছে চম্পা মাসীর কাছ থেকে। এসব শুনে যেনো আকাশ ভেঙে মাথায় পড়লো তার। বিশ্বাস করতে কষ্ট হলেও আস্তে আস্তে বিশ্বাস করে। বহুবার এখান থেকে সে পালাবার চেষ্টা ও করেছে কিন্তু কোনো লাভ হয়নি। অবশেষে নিজের ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসের কাছে পরাজিত হয়ে সে থেকে গিয়েছে এখানে।

দেখতে দেখতে সাত বছর অতিক্রান্ত। এই কয়েক বছরে অনেক পরিবর্তন হয়েছে অন্নপূর্ণার। বাবা মায়ের দেওয়া নাম বদলে চামেলী নামেই পরিচিত হয়েছে। অন্নপূর্ণা নামটা চিরকালের জন্য বিদায় নিয়েছে তার থেকে। পরনে সুতিশাড়ি শাখা সিঁদুরের বদলে উঠেছে দামী শাড়ি, শাখা সিঁদুরের কোনো বালাই নেই তার অঙ্গে। তার বদলে উঠেছে চোখে কাজল ঠোঁটে লিপস্টিক। যা এক মুহূর্তে যে কোনো পুরুষকেই আকর্ষিত করে তোলে। এই নগ্নপল্লির সব থেকে সুন্দরী মহিলা সে। তার সঙ্গে একটা রাত কাটানো জন্য হাজার হাজার টাকা ব্যয় করে সভ্য সমাজের বাবুরা।

এই সাত বছরে বেশ কয়েকবার প্রেগনেন্ট হয়েছে সে। কিন্তু চম্পা মাসী তাকে কিছুতেই সে বাচ্চার জন্ম দিতে দেইনি যখনই সে বুঝতে পেরেছে চামেলী প্রেগনেন্ট সেই মুহূর্তেই অ্যাব্রোষণ করিয়েছে। চামেলীকে বুঝিয়েছে তাদের মত মহিলাদের মা হতে নেই সে বাচ্চার কোনো ভবিষ্যৎ থাকে না। মাথা কুটে অপমানে অবহেলায় মরতে হয় তাকে। ভয় ছিল চামেলীর যদি সত্যি এমন হয় নিজের সন্তানের এমন কষ্ট সে দেখতে পারবে না। কিন্তু এবার যখন সে প্রেগনেন্ট হলো চম্পা মাসী বারবার তাকে অ্যাব্রোশন করার কথা বললেও সে রাজি হয় না। সে বলে এবার অন্তত সে মা ডাক শুনবে জন্ম দেবে সে তার সন্তানের। তার জেদের কাছে হার মেনে চম্পা মাসী। অগত্যা চামেলীর কথায় রাজী হয়ে যায় কিন্তু শর্ত দেই যদি ছেলে হয় তো নিজের কাছে রাখতে পারবে সে আর যদি মেয়ে হয় তো একটু বড় হলেই তুলে দিতে হবে চম্পা মাসীর হাতে। চম্পা মাসী তাকেও এ ব্যবসার কাজে লাগাবে। দেখতে দেখতে দিন চলে আসে সে জন্ম দেয় এক ফুটফুটে কন্যা সন্তান। তার এই কুটুরি যেনো আলো করে আছে সেই কন্যা। তাকে ঘিরে আজ যেনো জমায়েত হচ্ছে। এই প্রথম কেউ সন্তান জন্ম দিল। এখানে তো হয় মেয়েদের কে তুলে আনা হয়, না হয় বিশুর মত লোকেরা

এসে বিক্রি করে যায়। এ যেনো দেব দর্শন। মহল্লার সবাই খুব খুশি। কিন্তু খুশি হতে পারে না চামেলী। এ যে মেয়ে সন্তান আর চম্পা বাই তো বলেছিল মেয়ে হলেই সে একটু বড় হলে তাকে ব্যবসার কাজে লাগাবে মা হয়ে মেয়ের এমন কষ্ট সে কি ভাবে সহ্য করবে। না কিছুই ভাবতে পারছে না সে। সব যেনো ওলোট পালোট হয়ে যাচ্ছে। সে মনে প্রাণে চেয়েছিল তার ছেলে হোক কিন্তু ভাগ্য তো তার চিরকালই সাথ দেইনি এবার ও দিল না। কি করবে সে কোথায় লুকাবে সে এসব ভাবতে ভাবতে ঘোরের মধ্যে চলে যায় তার চেতন ফেরে চম্পা মাসীর ডাকে। সে মহা খুশি, সে চামেলী বলে এ শিশু আমি নিয়ে যাবো, আমার কাছেই বড় হবে ও। চমকে ওঠে সে কি করবে বুঝতে পারে না, সে জানে এবার আর কোনো জোর খাটবে না। চম্পা বাই নিয়ে যাবে বলেছে যখন নিয়েই যাবে। আর এ বাচ্চার জীবনকে নরক করে তুলবে। তার হাতের কাছেই পড়ে ছিল ধরলো এক ছুরি একটু আগে যেটা দিয়ে ডাক্তার নাড়ি কেটেছে তার থেকে কন্যাটাকে আলাদা করেছে। এদিক ওদিক তাকিয়ে সন্তর্পনে তুলে নেই হতে সেই ছুরি আর সজোরে পোচ চালায় বাচ্চাটার গলার। একটু নড়া চড়া করে উঠেই থেমে যায় বাচ্চাটার দেহ। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোতে থাকে যা ক্রমশ সারা ঘরময় হয়ে উঠতে থাকে। ঘর ময় লোক অবাক চম্পা বাই বাচ্চাটার গায়ে হাত দিয়ে দেখে কোনো সাড়া নেই, আস্তে আস্তে ঠান্ডা হতে শুরু করেছে। আর চামেলী একটানা বাচ্চাটার দিকে তাকিয়ে আছে। চম্পা বাই এবার সজোরে চর কষিয়ে দিল চামেলীর গালে আর জিজ্ঞেস করে কেনো করলো সে এমন। ডুকরে কেঁদে ওঠে চামেলী আর বলতে থাকে মুক্তি দিল সে তার মেয়েকে। এ নরক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিল সে মুক্তি।

প্রতিশ্রুতি

জুয়েল রাণা মাসুদ
ষষ্ঠ সেমেস্টার, প্রাণীবিদ্যা বিভাগ (অনার্স)

আনন্দ-উল্লাস নতুন আমেজ নতুন ক্লাসে ওঠার। নতুন নতুন বন্ধু হতে থাকল। বেশ কিছুদিন যেতেই কয়েক জন মিলে একটা দল তৈরী হয়ে গেলাম। বন্ধুত্বের গাঢ়ত্ব বেশ জমজমাট হল। দলের সবাই নতুন ছিলাম, তা সত্ত্বেও অঙ্কুরের সাথে বন্ধুত্বের বাঁধন একটু বেশি ছিল অন্যদের তুলনায়। অঙ্কুর জানাল সে স্কুলের জুনিয়র ক্লাসের আঁখির সাথে প্রেমের জালে জড়িয়েছে। এমন ভাবে কাটল কয়েকমাস। একদিন টিউশান থেকে বাড়ি ফেরার সময় রাস্তার যানজটে সাইকেল থামিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ শুনতে পেলাম অঙ্কুরের গলার আওয়াজ; ডাকছে আমায়। ভিড় ঠেলে ঠুলে অঙ্কুর কাছে আসতেই জিজ্ঞাসা করলাম, এই রাত ১১টার সময় তুই এখানে কেন?

লাজুক স্বরে উত্তর ওল, আঁখি লাল চুল পছন্দ করে, উত্তর শেষ হতেই জিজ্ঞাসা করলাম রং কিনতে এলি?

অঙ্কুর বলল, নাহরে, রং আঁখি দিয়েছে টক দই কিনতে এলাম। আজই রাতে রংটা দই দিয়ে চুলে লাগাব।

ইতিমধ্যেই যানজট একটু কমতেই শুভরাত্রি জানিয়ে বাড়ির দিকে রওনা।

বাড়ি ফিরে রাতের খাওয়া সেরে নিদ্রাচ্ছন্ন হলাম। সকালে উঠে হাত মুখ ধুয়ে ব্যাগ গুছিয়ে সাইকেলটা নিয়ে মাকে বলে বেরিয়ে গেলাম বাড়ি থেকে পড়তে যাওয়ার জন্য। যাওয়ার সময় রাস্তায় আঁখির সালে দেখা। একে অপরকে সুপ্রভাত জানিয়ে গন্তব্যের দৃষ্টিতে।

আঁখি ও অঙ্কুরের ভালোবাসা প্রমাণ দেয় ভালোবাসা, ধনী-গরিব দেখেনা।

আঁখি বড়োলোক বাড়ির একমাত্র মেয়ে একটি ছোট ভাই আছে।

অঙ্কুর মধ্যবিত্ত পরিবারের ছোটো ছেলে বড়ো দিদি আছে।

আঁখি-অঙ্কুর সম্পর্কে এতটুকু জেনে চলুন গল্পের বাঁকি অংশ থেকে শেষটুকু দেখি —

কালু আর আমি গল্প করতে করতে সাইকেল চালিয়ে টিউশন পড়ে ফিরতি পথে। কালু হল আমাদের দলের সব থেকে ফর্সা ছেলে, যতই ফর্সা হোক আমরা বন্ধুরা কালু বলেই ওকে ডাকি। কালু ওর ডাক নাম ভালো নাম অভি।

কালু বলল দেখ স্কুলের রাস্তার পাশে দোকানের বেঞ্চেতে আঁখি আর চুল রাঙানো অঙ্কুর আইসক্রিম নিয়ে ঘনিষ্ঠ ভাবে বসে। আঁখি অঙ্কুরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে কয়েক দিন আগেই যে ''অঙ্কুর জীবনে যে কাজই করুক আঁখি তার পাশ থাকবে''। অনেক কঠিন গণিত সমাধান করে ফেলি নিমেষেই আমি আর কালু। কিন্তু আমি কালু কেউই এই প্রতিশ্রুতির হিসাব মেলাতে পারিনি। হিসাব না মিললেও আমরা সময় মতো যে যার বাড়ি ফিরে গেলাম। এভাবে কাটতে থাকল দিন, মাস, বছর, স্কুল জীবন শেষ হল। বেশ কয়েক বছর গেল দলের বন্ধুদের সাথে শেষ দেখা ছিল স্কুল জীবনের শেষ দিন। এখন আমি থানার 'ওসি'। হঠাৎ একদিন ঘামখেয়ালিপনাতে পৌঁছলাম বাজার পরিদর্শনে। বাজারে ঘুরতে ঘুরতে নজর পড়ল এক সবজি বিক্রেতার উপরে। মুখটা যেন চেনা চেনা লাগছে। কেটু এগিয়ে গিয়ে বুঝলাম ওটা অঙ্কুর, পরণে ময়লা কাপড়, মাথায় আধা পাকা চুলে লাল গামছা বেঁধে রাখার কারণে প্রথমে একটু চিনতে অসুবিধা হলেও এখন স্পষ্ট চিনতে পারলাম। এগিয়ে অঙ্কুরের কাছে যাব এমন সময় থমকে দাড়িয়ে গেলাম। দেখলাম চমকপ্রদ সুন্দর শাড়ি পরে এক ভদ্র মহিলা এসে দাড়াল সবজি কিনতে। এই মহিলা আর কেউ নন জুনিয়র ক্লাসের সেই

আঁখি, লাল চুল পছন্দ করা। অঙ্কুরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। আঁখির বেশভূষা দেখে বেশ বোঝা যাচ্ছে যে সে আজ কোনো এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের বধূ। বড়োলোকিয়ানা চালে আঁখি সবজি বিক্রেতা অঙ্কুরকে বলল — 'ভালো দেখে তাজা সবজি দিয়ে দে। দাম কত হল বল?' সবজিগুলো থলিতে দিয়ে অঙ্কুর গামছা দিয়ে মুখটা মুঝে বলল সর্বমোট ৭০ টাকা দিলেই হবে। আঁখি ১০০ টাকার একটা নোট অঙ্কুরের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল বাকিটাকাটুকু আর ফেরত দিতে হবে না। এই বলে চলে গেল। ইতিমধ্যেই মিলে গেল না মেলা সেই হিসাব। নিয়তির বিরূপতা দেখে ভাবলাম মেয়েটি তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেনি — ''অঙ্কুর জীবনে যে কাজই করুক আঁখি তার পাশেই থাকবে।''

অঙ্কুর বাজারের সবজি বিক্রেতা। আঁখি ৩০ টাকা বাড়তি দিয়ে তাকে সাহায্য করেছে। আক্ষরিক অর্থে আঁখি অঙ্কুরের পাশে দাড়িয়েছে।

অফিসে ফিরে চেয়ারে বসে পড়লাম একজন এসে চা দিয়ে গেল। চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে ভাবলাম স্কুল জীবনে কালু ও আমি যে হিসাব মেলাতে পারিনি। আজ ভিড়ে কোলাহলে সেই হিসাব মিলে গেল 'প্রতিশ্রুতির দাম ৩০ টাকা'। কালু হয়তো জানতে পারবে না প্রতিশ্রুতির এই হিসাব।

টার্গেট

টুকাই সরকার,
৪র্থ সেমেস্টার, বি.এস.সি. (বায়ো জেনারেল)

গলি দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ গলির পথটা শেষ হয়ে গেল। কিন্তু এরকমতো কথা ছিলনা। টেলিকলার সুপর্ণা যে ঠিকানা দিয়েছিল তা তো গলিটা ডানদিকে বাঁক নেবে তারপর ৩টি বাড়ি পরে সেই বাড়ি। যে বাড়িতে জয়ন্ত যাবে। তাহলে কি গলি ভুল করল? আবার ঘুরে বড় রাস্তায় যেতে হবে।

জয়ন্ত সারাজীবন এরকম যে কত ঘুরেছে তার ঠিক নেই। অনেক কিছু হওয়ার ইচ্ছা একে একে ব্যর্থ হয়েছে। অবশেষে ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানির এজেন্টের কাজ পেয়েছে। চলনসই মাইনে, আর টার্গেট ফিলাপ করলেই ইনসেনটিভ আছে। সব মিলিয়ে হাজার কুড়ি টাকা তো মাসে ওর স্যালারি অ্যাকাউন্টে জমা পড়ে। একটা সংস্থান হল বলেই জয়ন্ত বিয়ে করে ফেললো রিয়াকে। আসলে রিয়াও আর অপেক্ষা করতে চাইছিল না। বিয়ে হল প্রায় তিন বছর। একমাত্র সন্তান নীলের বয়স এখন ১ বছর। অফিস থেকে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে পারবে। কিন্তু দিন শেষে ওদের গ্রুপ লিডার সুনন্দ হঠাৎ এসে ঠিকানাটা ধরিয়ে দিল। বলল — জয়ন্ত যা বড় পার্টি ভাল করে বোঝাতে পারলে তোর টার্গেট একসিড করে যাবে। জয়ন্তর মনে মনে ভীষণ রাগ হয়েছিল। মৃদুভাবে বলল — সুনন্দদা এখন রাত ৮টা বাজে, তুমি আমাকে সখের বাজার পাঠাচ্ছো। এখানে কাজ সেরে কখন বারাসাত ফিরবো। সুনন্দদা বলল — দেখ বস্বে, দিল্লি অফিস এগিয়ে আছে। কলকাতা প্রত্যেক মাসেই প্রথম হচ্ছে। সেটা তো ধরে রাখতে হবে। ঠিক আছে, যা তোকে কিছু এক্সট্রা ইনসেনটিভ পাইয়ে দেব। কিন্তু কাজ তুলে আনতে হবে। দেখবো তোর ক্যারিশমা। হ্যারি আপ, এগিয়ে যা জয়ন্ত। অগত্যা জয়ন্ত হাঁটছে, শুধু হাঁটছে। আর ভাবছে — আচ্ছা এখন নীল কি করছে? হয়তো মার কোলে বসে খাচ্ছে অথবা টলতে টলতে এসে মার কোলে লাফিয়ে পরছে।

দিন কয়েক আগে রিয়া বলেছিল — জান, তোমার নীল বা-বা বলে ডাকতে শিখেছে।

জয়ন্ত বলেছিল — তাই নাকি কিন্তু ও কি করে ডাকবে। ও তো আমায় দেখারই সুযোগ পায় না।

কেন আমি শিখিয়েছি —

জয়ন্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবে এভাবেই মায়ের চোখেই বাবাকে দেখতে দেখেতে ওর শৈশব কেটে যাবে।

এবারে জয়ন্তর আর ভুল হয়নি। ঠিক গলি। তিন নম্বর বাড়ি। মোবাইলে রিং করার সুবাদে ভদ্রলোক গেটেই হাজির ছিলেন। জয়ন্ত ঘরে ঢুকেই কাগজপত্র বার করে ভদ্রলোককে বোঝাতে শুরু করলো। কত রাখলে সুদ সমেত পাঁচ বছরে কত পাওয়া যাবে। তাছাড়া যে কোন সময় আপনি সারেন্ডার করলে টাকা ফেরত পাবেন। যদিও আমাদের একটা লক পিরিয়ড আছে। সেটা হল তিন বছর। তারপর ভাঙালে আর কোন টাকা কাটা যাবে না। ভদ্রলোকের বয়স প্রায় ষাট বছর। চশমাটা নাকের উপর থেকে ঠেলে উপরে উঠিয়ে জয়ন্তর ল্যাপটপের উপর ভালো করে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। জয়ন্ত জানে এখন একটু সময় দেওয়া দরকার। তাই ল্যাপটপটা ওনার দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে দেখার সুযোগ করে দিল। মনযোগ সহকারে উনি দেখতে লাগলেন। জয়ন্ত ভাবছে এবার মোক্ষম চালটা দিতে হবে। দেখুন স্যার এখন আমাদের একটা স্পেশাল অফার আছে, যদি আপনি বার্ষিক ১ লাখ টাকার প্রিমিয়াম দেন তাহলে আপনি গোল্ড কয়েন পাবেন যেটা আপনি ভবিষ্যতে কাজে লাগাতে পারবেন। বলেই গোল্ড কয়েনটা হাতে তুলে দিলেন। কয়েনটা নিয়েই ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন —বললেন একটু বসুন আমি আসছি। জয়ন্ত ঘড়ির কাঁটার দিকে দেখল, ৯.৩০ টার ঘর পার হয়ে গেছে। ভাবছে কখন বাড়ি ফিরবে .....

এমন সময় দুজন ঘরে প্রবেশ করলেন। বোঝাই গেল সঙ্গে মাসিমা এসেছেন। কয়েনটা এখন তারই হাতে; তিনি বললেন আচ্ছা সোনাটা আসল তো? জয়ন্ত বলল — হ্যাঁ মাসিমা এটা একেবারে পিওর গোল্ড। এ ব্যাপারে একশ শতাংশ গ্যারান্টি দিচ্ছি। এবার দুজনের মুখ চাওয়াচাওয়ি দেখে বুঝল গৃহিনীর সম্মতি আছে। এবারে ভদ্রলোক বললেন — সবই তো ঠিক আছে কিন্তু প্রাইভেট ব্যাঙ্ক — একদম ভয় নেই নেই, আমাদের 'আর.বি.আই' অনুমতিপত্র আছে — তাছাড়া আমাদের ইন্টারন্যাশনার ব্যাঙ্ক। পৃথিবীর সব প্রান্তেই আমাদের শাখা আছে দেখুন। আমাদের হেড অফিস নিউইয়র্ক। আপনি যে কোন দেশ থেকেই মানি এনক্যাশ করতে পারবেন। ভদ্রলোক এবারে চেক বার করলেন।

১ লাখ টাকার চেক নিয়ে জয়ন্ত বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল।

প্যাঁচ প্যাঁচে ভিড় বনগাঁ লোকালে। এত রাতে এখনও এত লোক বাড়ির বাইরে। সবাই জয়ন্তর মতো বাড়ি ফিরতে আকুল। জয়ন্ত বাড়ি ফিরে কোন মতে ক্লান্ত শরীরটা চেয়ারে এলিয়ে দিল। নীল ঘুমের দেশে অনেক আগেই। খাবার টেবিলে রিয়ার দু'একটা গল্প করার ইচ্ছা হচ্ছিল। কিন্তু জয়ন্তর অবস্থা দেখে তা আর হল না। খাবার পর জয়ন্ত ছেলের পাশে নিঃশব্দে শুয়ে পড়ল। তারপর ছেলেকে আদর করতে থাকল। কিছুক্ষণ পর রিয়া এসে ভাবলো জয়ন্ত বোধহয় ঘুমিয়ে পরেছে। তার কপালে হাত রাখতেই বলে উঠলো — জানো আজ আমি এমাসের টার্গেট ফুলফিল করলাম। ঠান্ডা ঘরে বসে 'বিগবসরা টার্গেট দেবে, আমরা তা প্রানপণে ফুলফিল করবো। সারা দুনিয়াটা এখন বিগবসদের টার্গেট। ফুলফিল না করতে পারলে শাস্তি — হয় মাইনে কেটে নেবে, অথবা সারাদিন একটা চেয়ারে বসিয়ে রাখবে অন্ধকার ঘরে। না হয় অফিসের মধ্যে হামাগুড়ি দেওয়া। যেন ওরা মালিক বাকি সব ওদের কাছে ক্রীতদাস। কথাগুলি বলে নীলের দিকে ঘুরে আলতো করে নীলকে বুকের মধ্যে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

রিয়া এখন একা। বড় একা। মনে মনে ভাবল — জয় যতই ছেলেকে বুকের আড়াল কর, এই টার্গেট সর্বস্ব জগৎ থেকে ওকে আড়াল করতে পারবে না। — প্রেম, ভালবাসা, সম্পর্ক, বন্ধন — সবই ওই টার্গেটের কাছে।

আবারও রিয়ার সকাল হবে। জয়ের চা, নীলের খাবার, জয়ের স্নানের জন, রান্না ও সংসারের খুঁটিনাটি কাজ নিয়ে শুরু হবে আরও একটি নতুন দিন।

আর জয়ন্তর শুরু হবে আরও একটা ''টার্গেট''।

মহাকাশের মহাঅতিথি

আকিব গাজী
৩য় সেমেস্টার, বি.এস.সি (জেনারেল)

ব্যালকনিতে হেলান দিয়ে কয়েকমুঠো ছোটোবেলার স্মৃতিতে চোখ বোলাচ্ছিলেন ড. আর্থার। পাঁচিলের বাইরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা কুকুরটাকে দেখে তার মনে পড়ে গেলো তার ছোটোবেলার বস্তু বার্কার-এর কথা। মনে পড়ে গেলো তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা কতো স্মৃতি, কতো হুড়োমুড়ির কথা।

দেয়াল ঘড়িতে ন'টা বাজার শব্দে হুঁশ ফিরল তার। একমুহূর্তে মনে হলো ছেলেকে স্কুলে দিয়ে আসার কথা, পরক্ষণেই মনে পড়ল — কোথায় স্কুল! সবকিছুই তো বন্ধ হয়ে গিয়েছে। শহরের চেনা ছবিগুলো — এতো হুড়োহুড়ি, এতো ছুটোছুটি আজ আর কিছুই নেই। পৃথিবীর আয়ু ও তো আর কয়েকদিন মাত্র। তারপর হয়তো কোনো এক মুহূর্তে মহাবিশ্ব থেকে চিরতরে হারিয়ে যাবে আমাদের পৃথিবী। মহাশূন্য থেকে হারিয়ে যাবে তার সমস্ত পথচলার কিছু। আর সেই সঙ্গে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে মানুষসহ সমস্ত প্রাণী। নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে দক্ষ হাতে। কোমল তুলিতে বোলানো ছবির রংগুলো। আর, ... নাহ্, আর সে ভাবতে পারছে না। নিজের অজান্তেই প্রিয় কুকুর লারা-র সঙ্গে খেলায় ব্যস্ত থাকা ছেলেকে কোলে টেনে বুকে জড়িয়ে সে।

আজ থেকে তিন দিন আগে, মানে ২২শে সেপ্টেম্বর ২০৩৫, NASA-র বিজ্ঞানীরা জানান যে, পৃথিবী থেকে অনেক দূরে থাকা কোনো এক অজ্ঞাত বস্তু থেকে তাদেরকে অর্থাৎ পৃথিবীবাসীর জন্যে একটি ম্যাসেজ (বার্তা) পাঠানো হয়েছে। সেটিকে ডিকোড করে একটি ভিডিও পাওয়া গেছে, সেখানো দেখানো হয়েছে অত্যাধুনিক সব মারণাস্ত্র এবং ধ্বংসাত্বক ইউরেনিয়াম বোমা। এখনো পর্যন্ত মানুষের তৈরি প্রযুক্তিতে এই বিস্ফোরক তৈরি করা সম্ভব হয়নি। তেজস্ক্রীয় পদার্থ ইউরেনিয়াম থেকে তৈরি হওয়ায়, এই মারণাস্ত্রের একটি বিস্ফোরণে পরমানু বোমার চেয়ে কয়েক হাজার গুণ বেশি রেডিয়েশান উৎপন্ন হতে পারে বলে ধারণা করেছেন পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা। মনে করা হচ্ছে যে, এ কোনো অন্য গ্রহের প্রাণী অর্থাৎ এলিয়েনের কাজ। কারণ মানুষ এখনো পর্যন্ত এইধরণের অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র তৈরি করতে সক্ষম হয়নি। আর সবচেয়ে বড়ো কথা হল, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ (২০৩০ সাল)-এর পরে আন্তর্জাতিকভাবে সমস্ত দেশের মারণাস্ত্র গবেষণা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

যাইহোক, এই প্রথম ম্যাসেজের কোনো অর্থ পরিস্কারভাবে বোঝা যায়নি। সবকিছু ওলোট-পালোট করে দিলো ২৫শে সেপ্টেম্বরে পাওয়া দ্বিতীয় ম্যাসেজটি। দেখানো বলা হয়েছে যা, তা ডিকোড করলে অনেকটা এরকম দাঁড়াই —

"Get ready to be destroyed."

অর্থাৎ, ''ধ্বংস হতে প্রস্তুত হও।"

— এই দ্বিতীয় ম্যাসেজটি যে বস্তু থেকে এসেছে, বিজ্ঞানীদের হিসাব অনুযায়ী, এই বস্তুটি প্রথমবার ম্যাসেজ আসা বস্তুটির তুলনায় পৃথিবীর অনেক কাছে। অর্থাৎ, এই দু-দিনে বস্তুটার অবস্থানের অনেকটা পরিবর্তন হয়েছে। আর, তার থেকেই ধারণা করা হচ্ছে যে, এটি আসলে ভিনগ্রহের প্রাণীদের একটি জাহাজ বা 'এলিয়েনশিপ', সেটি প্রচণ্ড গতিতে পৃথিবীর দিকে ছুটে আসছে পৃথিবীকে ধ্বংস করার জন্য।

এই ঘটনার পর থেকে সবাই সবকিছু ছেড়ে নিজের আপনজনেদের সাথে জীবনের শেষের পাতার কিছু সময় কাটানোর জন্যে বাড়িতেই থাকতে শুরু করেছে। যদিও প্রতিটা দেশের সরকার জনগণকে স্বস্তির আশ্বাস দেওয়ার চেষ্টা করছে। তবে সেসব সান্ত্বনা মাত্র। আর্থারও আর সকলের মতোই বাড়িতে তার ছেলে এবং প্রিয় পোষ্য লারা-র সাথে সময় কাটাচ্ছে, আর অপেক্ষা করছে সেই

চরম মুহূর্তের জন্যে। — সে নিজে একজন বিজ্ঞানী হয়েও পৃথিবীকে এই আকস্মিক, অজ্ঞান বিপদের হাত থেকে বাঁচানোর কোনো উপায়ই দেখতে পাচ্ছে না।

এইবার বলি আর্থারের বাবার কথা, তিনি একজন মহাকাশ বিজ্ঞানী ছিলেন। একসময় NASA-তে প্রোজেক্ট পরিচালনা করতেন। আর্থারেরা বংশ পরম্পরায় বাবা, ঠাকুরদা সকলেই মহাকাশ গবেষণার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তার ঠাকুরদা, ড. অস্টিন ১৯৫৭ সালে রাশিয়ার Sputnik-2 মিশনের একজন সদস্য ছিলেন। যেখানে নিশ্চিতমৃত্যু জেনেও একটি নিরীহ প্রাণীকে মানুষ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য পাঠিয়েছিল মহাকাশের নিশ্চিদ্র অন্ধকারে।

রাস্তার কুকুরটিকে ছোটোবেলায় আর্থারের বাবা-ই রাস্তার ধারে পোস্টের গোড়া থেকে তুলে বাড়িতে নিয়ে এসেছিল। ধীরে ধীরে আর্থারের বাবা ও কুকুরটার মধ্যে গড়ে উঠেছিল এক গভীর ভালোবাসার সম্পর্ক যেমনটা আজ আর্থারের ছেলে ও লারা-র মধ্যে সম্পর্ক। হঠাৎ একদিন তাদের সম্পর্কে কার যেন কুনজর পড়ল। আর্থারের দাদু ড. অস্টিন তাদের Sputnik-2-এর একটি কুকুরের প্রয়োজন মেটানোর জন্য তাঁর নিজের ছেলের প্রিয় পোষ্যটিকে বেছে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। খুব কেঁদেছিলো সেদিন আর্থারের বাবা লাইকার জন্যে। সেও হয়তো খুব কেঁদেছিলো নিঃশব্দে। তাতে কী ! কি-ই বা দাম ছিলো তার সেই কাঁদার ! সামান্য একটা কুকুরের হৃদয়ফাটা কান্না সেদিন কারো চোখে পড়েনি। সভ্য সমাজের কোনো মানুষ সেদিন একবারও ভাবেনি তার নিস্পাপ বাচ্ছাদুটোর কথা। লাইকার বাচ্ছাদুটোর মধ্যেই সেদিন লাইকাকে খুঁজে পেয়েছিল আর্থারের বাবা। আর সেই বংশধর আজও রয়েছে তাদের সঙ্গে। লারা-ই হলো লাইকার বংশধর যার কোনো এক পূর্বপুরুষ নাকি মানুষের স্বার্থে সর্বপ্রথম মহাকাশে পাড়ি দিয়েছিল, ছুঁয়েছিলো হাজারো তারা, দেখেছিলো মানুষের চরম স্বার্থপরতা, নিষ্ঠুরতা।

আর্থার হয়তো আজ এসব কথাই ভাবছিলো। ভাবছিলো মানুষের চরম ব্যর্থতার কথা। উন্নতির সর্ব্বোচ্চ শিখর ছুঁয়ে নেওয়াার পরও মানুষ আজ এসে পড়েছে সেই মাটিরই কোলে। আবারও প্রকৃতির কাছে মানুষ খুব অসহায় এখন। মহাকাশে আজ আর একটিও space station-নেই। আমেরিকা তাদের চুক্তিপত্র অনুযায়ী ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারীতে ধ্বংস করে দিয়েছে কয়েকদশক ধরে মহাকাশে ছাপিয়ে বেড়ানো মানুষের তৈরী সর্বশ্রেষ্ঠ আবিস্কার, এক এবং অদ্বিতীয় International Space Station বা ISS। এরপর যদিও চিনের নতুন করে মহাকাশে Space Station পাঠানো কথা ছিলো। কিন্তু তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা সব হিসেব ওলোট-পালোট করে দেয়। সময়ের কাছে হার মেনে পৃথিবীর চারিদেক ঘুরতে থাকা স্যাটেলাইট গুলো ও অকেজো হয়ে হারিয়ে গিয়েছে। গত পাঁচ বছরে পৃথিবী থেকে স্যাটেলাইট-ই এখনো পর্যন্ত ধিক্ ধিক্ করে ঘুরছে পৃথিবীর চারিপাশে। তবে সেগুলো থেকেও যে তথ্যগুলো পাওয়া যায় তা ততটাও নিখুঁত নয়। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে পারমানবিক অস্ত্র ব্যবহারের ফলে বেশির ভাগ গবেষণাগার এবং স্যাটেলাইট রিসিভারগুলো অকেজো হয়ে পড়েছে। এদিকে পৃথিবীর অর্থনীতি মুখ থুবড়ে পড়ায় নতুন করে গবেষণাতে অর্থব্যয় করার ক্ষমতা পৃথিবীর কোনো দেশেরই নেই।

আরও অনেক বিজ্ঞানীদের মতো আর্থারও একটি ব্যাপারে প্রবল ঘটকা পোষণ করে। অনেকের মতে, সেদিন ISS-প্রশান্ত মহাসাগর ডোবানোর আগেই মহাকাশে হারিয়ে গিয়েছিল যান্ত্রিক ত্রুটির ফলে। যদিও NASA-র তরফ থেকে একথা কখনই স্বীকার করা হয়নি। যাইহোক, এখন আর এসব কথা ভেবে লাভ নেই। এতদিনে কতো জঞ্জালই তো জমেছে মহাকাশে। মহাকাশ এখন পরিণত হয়েছে চলমান কবরস্থানে। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে মৃত মানুষের শরীরগুলো এখন স্পেস-স্যুটের মধ্যে করে একটি বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যেও প্রবল বেগে ঘুরিয়ে জুঁড়ে দেওয়া হয় পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বাঁধা পার করে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাইরে। কারণ, পৃথিবীর আবহাওয়া তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরমানবিক অস্ত্র ব্যবহারের বজ্রপদার্থগুলিকে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাইরে পাঠিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পৃথিবীর সমস্ত দেশগুলি। হয়তো এসবেরই মাঝে কোথাও হারিয়ে গিয়েছে ISS।

একের পর এক রুদ্ধশ্বাস মুহূর্তগুলো স্রোতহীন নদীর মতো বয়ে যাচ্ছিলো। দেখতে দেখতে আরো একটি দিন কেটে গেল। বিজ্ঞানীদের হিসেব অনুযায়ী ২৭শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে কোনো এক সময়ে হয়তো পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করবে সেই অজ্ঞাতবস্তু। অসহায় মানুষগুলো মৃত্যুভাবনায় যেন প্রতিমুহূর্তেই একটু-একটু করে মরছিল।

পাহাড় সমতুল্য মুহূর্তগুলো কাটাতে কাটাতে পুরোনো স্মৃতি জড়ানো জিনিসপত্রগুলো মায়ামেশানো চোখে দেখছিলো আর্থার। কাজের চাপে অনেক চেনা, প্রিয় জিনিসগুলো অচেনা হয়ে উঠেছিল তার কাছে। বাবার ড্রয়ারটা খুলে একটি পুরোনো মলাটের ডায়েরী খুঁজে পেল সে। একটা পাতা ওল্টাতেই বড়ো বড়ো অক্ষরে লেখা একটি নাম চোখেপড়ল তার, 'ড. অস্টিন।' অর্থাৎ, এটি তার দাদুর ডায়েরী। এই মেঘ না চাইতে জলের মতো পাওয়া ডায়েরী খুব আকৃষ্ট করছিল আর্থারেকে। প্রথমদিকের কয়েকটি পাতায় শুধুমাত্র ড. অস্টিনের কিছু সাধারণ ঘটনার কথার বিবরণ থাকলেও মাঝখানের কয়েকটি পাতায় একটি অসাধারণ ঘটনার বিবরণে চোখ আঁটকে গেলো আর্থারের। সেখানে উল্লেখ মানব ইতিহাসের একটি অতিগোপন এবং লজ্জাজনক এক্সপেরিমেন্টের কথা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির পরাজয়ের পর ভবিষ্যতের কথা ভেবে নিজেদেরকে আর বেশি শক্তিশালী করতে মরিয়া হয়ে উঠেছিল রাশিয়া। 'ALCOR'-নামক একটি রাশিয়ান সংস্থা লোকচক্ষুর আড়ালে 'Super Soldier'-তৈরির এক অতিগোপন পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছিল, যেখানে মানুষকে অর্ধ-যন্ত্রমানবে পরিণত করার প্রচেষ্টা চলছিল। এদের বুদ্ধি, শক্তি এবং আয়ু সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেকগুন বেশি হবে বলে মনে করা হচ্ছিল। দীর্ঘদিনের গবেষণার পর রাসায়নিক পদার্থের সংমিশ্রণে একটি তরল ফরমুলা তৈরিতে সক্ষম হয়েছিল তারা। তবে সেটি সফলভাবে মানবদেহে প্রয়োগের আগে অন্য কোনো প্রাণীয় দেহে প্রয়োগ করে প্রতিক্রিয়া দেখে নেওয়ার প্রয়োজন ছিল। বিজ্ঞানের আদিকাল থেকে মানুষ এরকমই করে এসেছে। যে প্রাণীর দেহে এটি প্রয়োগ করা হবে, তার মৃত্যুর পরেই নাকি এর ফলাফল পাওয়া সম্ভব। পদার্থটি প্রয়োগের কৌশল ছিল একটু অন্যরকম। যে প্রাণীর দেহে তরলটি প্রয়োগ করা হবে মৃত্যুর পরে তার শরীরে প্রচুর পরিমাণে রেডিয়েশান প্রবেশ করাতে হবে। এর ফলে প্রাণীটির প্রত্যেক শিলা-উপশিরার জড়িয়ে পড়া সেই রাসায়নিক পদার্থ এক জটিল রাসায়নিক বিক্রিয়ার মধ্য দিয় দেহের প্রতিটি কোষকে জীবন্ত করে তুলবে, যে কোষগুলি এরপর কোনো অক্সিজেন ছাড়াই বেঁচে থাকবে তবে এরপর পুষ্টি হিসাবে তাদের শুধুমাত্র প্রয়োজন হবে রেডিয়েশান-এর। যুদ্ধে মৃত সেনাদেরকে এইরকম যন্ত্রমানবে পরিণত করে সমস্ত পৃথিবীর উপর নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলো রাশিয়া।

সবকিছু ঠিকঠাক চললেও, এই পরীক্ষা পৃথিবীর মাটিতে বা বায়ুমণ্ডলের মধ্যে করা ছিল অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কারণ পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় রেডিয়েশান কন্ট্রোল করার মতো কোনো প্রযুক্তি তখনকার দিনে ছিল না। এর ফলে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের মধ্যে পরীক্ষাটি করলে, ছড়িয়ে পড়া রেডিয়েশান সমগ্র প্রাণীজগতের ভয়ানক ক্ষতি করতে পারতো। এই জন্য সবদিক ভেবেই এই পরীক্ষার জন্য উপযুক্ত জায়গা হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছিল মহাকাশকে।

এদিকে সেই বছরেই প্রথম প্রাণী হিসাবে মহাকাশে পাঠানো হচ্ছিল লাইকা-কে। মহাকাশের পথে সবে পা বাড়ানো মানুষের পক্ষে তখন মহাকাশ, অভিযান ছিল খুবই ব্যয়সাপেক্ষ। এর ফলে একই বছরে পরপর দুটো মহাকাশ অভিযান পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছিলো না রাশিয়ার পক্ষে। এই নানারকম সমস্যার সমাধান খুঁজতে গিয়ে এক জটিল হিসেব মিলে গেল 'ALCOR'-এর সদস্যদের মাথায়। কেউ বুঝতেই — পারলো না, মানুষের তৈরি কি-এক মহা ষড়যন্ত্রের শিকার হলো ছোট্টো নিরীহ প্রাণীটি। প্রথম প্রাণী হিসাবে মহাকাশে পাঠানোর নামে তার শরীরে প্রবেশ করানো হল সেই তরল পদার্থ। আর পৃথিবী থেকেই যেন মৃত্যুর ছাপটা মেরে দেওয়ার হল তার শরীরে। ধীরে ধীরে সামনে এলো সেই দিন, যেদিন লাইকার রকেটের শেষ আগুনটা ধরিয়ে দেওয়া হল। ১৯৫৭ সালের ৩রা নভেম্বর, মহাকাশের বুকে চিরতরে হারিয়ে গেলো লাইকা।

২৭শে সেপ্টেম্বর, হিসেব অনুযায়ী আজই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করার কথা সেই বস্তুটির। এদিকে অসহায়ভাবে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছিলো পৃথিবীর মাটিতে মানুষ নামের প্রাণীগুলো। আজ সবাই নিজের-নিজের জীবন বাঁচাতে ব্যস্ত। আজ কেউ ধনী না, কেউ গরীবও না। আজ সবার একটাই পরিচয়, সেটি হল 'প্রাণী'। সত্যিই তো ! সবাই তো শুধু এক-একটি প্রাণের অস্তিত্ব মাত্র ! কে বলেছিলো, মানুষই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রাণী ? কে অধিকার দিয়েছিল তাদেরকে, পৃথিবীর অন্যান্য নিরীহ, নিস্পাপ প্রাণগুলোর উপর নিজেদের কর্তৃত্ব ফলানোর ! আজ কোথায় তাদের শ্রেষ্ঠত্বের অহংকার ! কোথায় তাদের প্রযুক্তির বল-এ ক্ষমতা দেখানো গর্ব !

এইসময়, অন্তহীন মহাশূন্যের গাঢ় অন্ধকারের বুক চিরে, রক্ত-মাংস তবু যান্ত্রিক থাবাগুলোর নিপুণ চালনায় প্রায় আলোর গতিবেগে পৃথিবীর দিকে এগিয়ে আসছিলো এক আশ্চর্য প্রাণী। একদিন এভাবেই পৃথিবী থেকে ছুটে এসেছিল সে এই মহাকাশে। আজ আবার সে ফিরতে চলেছে সেই পৃথিবীতে। তবে তফাৎতা হলো সেদিন সে নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও একা এসেছিল, আজ সে নিজের ইচ্ছেতেই ফিরে যাচ্ছে। তবে একা নয়, হাজার হাজার সৈন্য নিয়ে। সেদিন হয়তো পৃথিবীর কিছু কৌতুহলী প্রাণীর উন্নতির জন্য নিজের জীবন বিসর্জন দিতে হয়েছিলো তাকে। আজ পৃথিবীর সেই স্বার্থপর প্রাণীগুলোকেই ধ্বংস করতে চলেছে সে। যুগ-যুগ ধরে প্রতিশোধের আশায় বেঁচে থাকা প্রাণীটির দুটি চোখ দিয়ে হিংস্রতার আগুন ঝরে পড়ছে। যেন চিৎকার করে নিজের ভাষায় বলতে থাকা করুন স্বরের আবেদনগুলো হিসেব নিতে চায় সে। আজ সে অনেক শক্তিশালী, অপ্রতিরোধ্য। তবে এতকিছু একনিমেষে রূপকথার গল্পের মতো হয়নি।

১৯৫৭-সালের ৩-রা নভেম্বর, লাইকার মহাকাশযান 'স্পুটনিক-II' উৎক্ষেপনের কিছুসময় পরেই মাত্র কয়েকদিনে তাড়াহুড়ো করে তৈরি করা রকেটে, যান্ত্রিক ত্রুটির ফলে রকেটের কেবিনের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। স্পেসস্যুটের জন্যে থাকা জোট প্রাণীটির জলে ভরা চোখগুলি মৃত্যুর সাথে লড়াই করতে করতে একসময়ই স্থির হয়ে গিয়েছিল। থেমে গিয়েছিল তাঁর হৃদস্পন্দন। এরপর কিছু বুঝে ওঠার আগেই স্পুটনিক-II এর সঙ্গে সমস্তরকম যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ROCOSMOS এবং ALCOR-এর বিজ্ঞানীদের। ফলে, যে ফরমুলার পরীক্ষা তারা লাইকার উপরে করতে চেয়েছিলো তা আর কখনো করা সম্ভব হয়নি। এই চরম ব্যর্থতার পর রাশিয়ার সরকার এই সংস্থার সমস্তরকম গবেষণা বন্ধ করে দেয়। কিন্তু তারা কোনোভাবেই বুঝতে পারেনি যে, নির্জন মহাকাশে সকলের চোখের আড়ালে সেদিন সফল হয়েছিলো তাদের গবেষণা। মহাকাশে প্রায় শূন্য সেলসিয়াসের নীচে তাপমাত্রায় অজ্ঞান হয়ে যাওয়া লাইকার দেহ ধ্বংস হয়নি। ALCOR-এর প্রয়োগ করা তরল পদার্থ ততক্ষণে তার শরীরের সমস্ত কোষে জড়িয়ে পড়ে, কোষের জেনেটিক পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। এরফলে লাইকার প্রতিটি কোষ এবং প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিণত হয়েছিল রক্তমাংসের যন্ত্রে। মহাকাশের বুকে সৃষ্টি হয়েছিল মানুষের চেয়ে উন্নততর, প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন এক প্রাণীর। কিন্তু সমস্যা হল, সেদিন তার জ্ঞান ফেরেনি। তার জ্ঞান ফেরার জন্য যে পরিমাণ রেডিয়েশন-এর প্রয়োজন ছিল তা সেসময় মহাকাশে ছিল না। সেই থেকে ২০৩০-সাল পর্যন্ত জ্ঞানহীন অবস্থাতেই মহাকাশে ঘুরে বেড়িয়েছে লাইকার দেহ।

সূর্যের বাইরের অংশের ক্ষয় অনেককাল আগে থেকেই হচ্ছিল। এরফলে সূর্যের বাইরের স্তরে বিস্ফোরণ ঘটায় প্রচুর পরিমানে রেডিয়েশান মহাশূন্যে জড়িয়ে পড়ছিল। এতদিনে এই ক্ষয়ের পরিমাণ অনেক বেড়েছে। সঙ্গে বেড়েছে রেডিয়েশান-এর পরিমাণও। ২০৩০-সালেরই কোনো এক দিনে খুলে গিয়েছিল স্পেসস্যুটের মধ্যে থাকা ছোট্টো প্রাণীটির দুটি চোখ। ALCOR-এর বিজ্ঞানীদের হিসেবের বাইরেই সেদিন সমস্ত স্মৃতি ফিরে পেয়েছিল সে। তখন থেকেই প্রতিশোধের আগুন জ্বলছিলো তার মধ্যে। তবে সবার প্রথমে তার প্রয়োজন ছিল একটি আশ্রয়স্থলের। বেশিদূর খুঁজে বেড়াতে হয়নি তাকে। কাছেই কক্ষপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে মহাশূন্যে ঘুরে বেড়ানো ISS-এর ধ্বংসাবশেষ। তবে এটিকে ধ্বংসাবশেষ বলা চলে না। ২০২৩-সালে ISS-কে ধ্বংস করার আগেই তাদের কমিউনিকেশান সিস্টেম থেকে হারিয়ে গিয়েছিল সেটি। তখন থেকেই এটি মহাশূন্যেই ঘুরে বেড়াচ্ছিল আর যেন লাইকার জন্যেই অপেক্ষায় ছিল। তার সেখানে পৌঁছানোর পরে প্রায় কয়েক যুগ পরেও সেদিন আলো জ্বলে উঠেছিল ISS-এ।

ISS-তখন লাইকার অধীনে, তবে লড়াইয়ের জন্য নিজের একটি সৈন্যদল প্রয়োজন ছিল। নিজের শরীরের রক্তের নমুনা ও DNA থেকে কয়েকদিনের মধ্যেই ISS-এর পরীক্ষাগারে তৈরি করে ফেললো সেই পদার্থ যা ১৯৫৭ সালে তার শরীরে প্রবেশ করানো হয়েছিল। এরপর থেকে গত পাঁচ বছর ধরে সে, পৃথিবী থেকে ছুঁড়ে দেওয়া মৃত মানবদেহগুলো-কে পরিণত করেছে যন্ত্রমানবে। তবে একটুখানি বদল এনেছে সে ফরমুলায়। সেটি হল, পুরোনো কোনো স্মৃতি, আবেগ, অনুভূতি — এসব কিছুই থাকবেনা তার তৈরি যন্ত্রমানব গুলোর মধ্যে।

কয়েক হাজার হৃদয়হীন, অনুভূতিহীন সৈন্য ও প্রচুর পরিমাণে বিধ্বংসী মারণাস্ত্র নিয়ে প্রচন্ড গতিতে মানুষের অস্তিত্বকে ধ্বংস

করতে পৃথিবীর দিকে ছুটে আসতে লাগলো মানুষেরই তৈরি ISS। চোখের সমনে নিজের বাচ্ছাদুটির মুখগুলো বারবার ভেসে উঠলেও, নিজের হৃদয়ের কোনো এক কোনে জমে থাকা আবেগগুলোকে মহাশূন্যেই পুতে ফেলল সে। আজ সে অপ্রতিরোধ্য, নিজের সিদ্ধান্তে অবিচল।

একসময় পৃথিবীর র‍্যাডারে ধরা পড়ল ISS। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই আকাঙ্কিত দিনে সকাল এগারোটা বেজে পঁয়ত্রিশ মিনিটে পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে প্রবেশ করলো লাইকা। রাশিয়ার উপকূলে, প্রশান্ত মহাসাগরের আকাশে এসে দাঁড়াল এটি। সারা পৃথিবীতে শোরগোল পড়ে গেল। ইন্টারনেটের মাধ্যমে সবাই তখন দেখতে পাচ্ছিল হারিয়ে যাওয়া মহাকাশ স্টেশনটিকে। প্রথমে কোনোরকম আক্রমণ হলো না সেখান থেকে। শুধুমাত্র একটি ড্রোন বেরিয়ে এলো এবং উড়ে গেল রাশিয়ার মহাকাশ গবেষণাকেন্দ্র ROSCOSMOS-এর দিকে। আর একটি মাত্র বিস্ফোরণে ধ্বংস করে দিলো যুগ যুগ ধরে কত গল্পের সাক্ষী হয়ে থাকা গবেষণা কেন্দ্রটিকে।

অগোছালো কেবিনে বসেই সব দেখছিলো লাইকা। কতো স্মৃতি এসে জমা হচ্ছিলো তার চোখের সামনে। সমস্ত মানুষ যখন রাস্তায় বেরিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করছিলো শেষ মুহূর্তের জন্য, করুন মুখগুলো দেখে কেমন যেনো হলো লাইকার। ছোটো ছেলেমেয়েগুলো বাবা-মার হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার উপর। তারা হয়তো জানেও না, তাদের সম্ভাব্য মৃত্যুর কারণ। ''সত্যিই তো! তারা তো কিছুই করেনি, তবে মরবে কেনো এই নিস্পাপ প্রাণগুলো!'' সে ও তো এরকমই একজনের সঙ্গে খেলা করত! একে-অপরকে খুব ভালোবাসতো তারা। আর্থারের বাবার কান্নাভরা চোখগুলো মনে পড়ল তার। এদিকে তার সৈন্যরা বিস্ফোরণের স্থানগুলি নির্দিষ্ট করে ইউরেনিয়াম কোষগুলি Active-করার কাজে ব্যস্ত।

ইতিমধ্যে আর্থারও তার ছেলে এবং লারা-কে নিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল। চারিদিকে উড়তে থাকা ড্রোনগুলির মধ্যে একটি হঠাৎ তাদের মাথার উপরে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল, কি যেন দেখছিল তার যান্ত্রিক চোখগুলো। সামনের ছবিটা দেখে একমুহূর্তের জন্য যেন হৃদস্পন্দন থেমে গেল লাইকার। কি একটা অদৃশ্য টান অনুভব করাল সে। হয়তো নিজের অজান্তেই চিনতে পারলো তার উত্তরসূরী 'লারা' এবং কাছের মানুষটিকে। অর্ধসত্য হওয়া সত্ত্বেও চোখদুটো জ্বলজ্বল করে উঠলো তার। সব হিসেব এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল তার।

> ''সত্যিই কি পৃথিবীর এই প্রাণীগুলো সবাই নিষ্ঠুর! সত্যিই তারা নিঃস্বার্থে ভালোবাসতে পারেনা! আজ ও তো অনেক নিঃস্বার্থ সম্পর্ক রয়েছে এখানে। ওই তো, একটা বাচ্ছার কোলে মাথা গুঁজে শুয়ে আছে একটি কুকুর। আজও দিন-রাত, জোয়ার-ভাঁটা হয় এখানে। আজও মানুষ-প্রাণী একে অপরের উপর নির্ভরশীল।''

ঠিক এই সময়েই Warning alarm বেজে উঠলো লাইকার কেবিনে। তার কম্পিউটারে ধরা পড়ল অন্য একটি মহাকাশযান। এটিও পৃথিবীর দিকেই আসছিলো। আসলে, মানুষেরই হিসাবে ভুল হয়েছিল। প্রথমদিন NASA-র বিজ্ঞানীরা যে ম্যাসেজটি পেয়েছিল, সেটি ISS-থেকে আসেইনি। এসেছিল অন্য একটি এলিয়েনশিপ থেকে। দুটো বস্তুর মধ্যে দূরত্ব ও সময়ের ব্যবধান অনেকটা সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় তারা দুটোকেই একটি বস্তু বলে মনে করেছিলো। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে প্রচন্ড পরিমাণে অর্থনৈতিক বিপর্যয় হওয়ায় অত্যাধুনিক যন্ত্রের অভাবে তাদের হিসাবেও ভুল হয়েছিল। কিছুসময়ের মধ্যেই এই মহাকাশযানটিও পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে প্রবেশ করলো। তবে সেটি কোনোরকম অপেক্ষা না করেই পৃথিবীর বড়ো বড়ো শহরগুলিতে বোমাবর্ষণ শুরু করল। এরা হলো 'ডারনেট' নামক গ্রহের বাসিন্দা। যারা বিভিন্ন মূল্যবান ধাতু ও জ্বালানীর খোঁজে ঘুরে বেড়ায় মহাবিশ্বের বিভিন্ন গ্রহে এবং তাই তারা পৃথিবীতে তাদের প্রধান বাধা মানুষ-কে ধ্বংস করতে চাইছিলো।

এদিকে লাইকার সৈন্যরাও তাদের সমস্ত মারণাস্ত্র Activate করে দিয়েছে। সেগুলি একবার সক্রিয় করে দিলে আর নিষ্ক্রিয় করা যায় না। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের মহাকাশযান অর্থাৎ ISS থেকেও মানুষের দিকে ছুটে যাবে, হাজার হাজার মারণাস্ত্র। আর মানষ এখন খুবই অসহায়,অবলা প্রাণীদের মতো প্রাণ বাঁচানোর জন্য এদিকে-ওদিকে ছুটোছুটি করছে।

চোখের সামনে সবকিছু দেখতে দেখতে হঠাৎ লাইকার হাত চলে গেলো কন্ট্রোল স্ক্রিনের ওপর। তার মহাকাশযানকে সামনের দিকে যাওয়ার নির্দেশ দিল সে। মুহূর্তের মধ্যে প্রচন্ড গতিতে প্রশান্ত মহাসাগরের আকাশে থাকা এলিয়েনশিপটার দিকে এগিয়ে চলল ISS। লাইকার সৈন্যরা যে মারণাস্ত্রগুলি Activate করেছিল, সেগুলি কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ISS থেকে তাদের গন্তব্যস্থলের দিকে যাত্রা শুরু করবে। লাইকা নিজেও জানেনা যে, সেকি করছে আর কেনই বা করছে। সে শুধু এটাই জানে, সে যেটাই করছে তাতে তার কোনো আফসোস নেই। একবার সামনের স্ক্রিনে লারা-র দিকে তাকিয়ে দেখে নিলো সে, আর সেই সঙ্গে সঙ্গেই ডারনেটিয়ানদের এলিয়েনশিপের সঙ্গে প্রচন্ড গতিতে ধাক্কা মারলো ISS, সেই মুহূর্তেই প্রচন্ড শব্দে একের পর এক বিস্ফোরিত হতে লাগলো Activate করে রাখা বোমাগুলি। একমুহূর্তে দুটো মহাকাশযানই চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ছড়িয়ে পড়লো প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে। ......

তার সঙ্গেই উত্তার সমুদ্রের বুকে ঝড়ে পড়ল কত পাওয়া-না পাওয়ার রাগ, ঝড়ে পড়লো কতো বোঝা-না বোঝার অভিমান।।

কলেজস্ট্রিটে কলরব

শুভজিৎ বিশ্বাস
৩য় সেমেস্টার, ফিজিক্স বিভাগ (অনার্স)

দুজন একসাথে বলে উঠল, ''দাদা, বুদ্ধদেব গুহের 'হলুদ বসন্ত' আছে?''

দোকানদার আর একজনের অর্পিতা সরকারের গোয়েন্দা উপন্যাস 'ট্রাফিক সিগন্যাল' দিতে দিতে একটু ব্যস্ততার সাথে বললেন, ''আছে, বোধহয়। রথিন, ভেতরে দেখ তো বুদ্ধবাবুর 'হলুদ বসন্ত' আছে কিনা!''

সহকর্মী রথিন দোকানের ভেতর থেকে জোরে বললেন, ''সমীরবাবু, একটাই আছে। দেব কি!''

আবার দু'জনে একসাথে বলে উঠল, ''আমাকে দিন।''

সমীরবাবু সন্দেহের চোখে বললেন, ''দু'জনে একটাই বই নেবে তো!''

এবার একসাথে নয়, মেয়েটি বললেন, ''আমাকে একটা দিন।''

সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটি বললেন, ''যেহেতু আমি আগে বলেছি, তাই বইটি আমাকে দেবেন।''

সমীরবাবু পড়লেন ঘোর সমস্যায় আর ছেলে মেয়ে দুটো জুড়ে দিল কলরব। হ্যাঁ, কলেজ স্ট্রিটে একটা 'হলুদ বসন্ত' আর দু'জনের কলরব।

অবশেষে বাধ্য হয়ে সমীরবাবু বললেন, ''অন্য দোকানগুলো একবার দেখে এসো, অন্য দোকানে যদি আর একটা পাওয়া যায়।''

ছেলেটি সমীরবাবুর কথা শেষ হওয়ার সাথে সাথেই বললেন, ''অন্য কোনো দোকানে নেই, আমি সব কটা স্টল ঘুরেই এখানে এসেছি।''

মেয়েটি ছেলেটিকে সঙ্গে সঙ্গে অনুরোধ করে নরম সুরে বললেন, ''তাহলে অনলাইনে কিনে নাও প্লিজ...... একটাই তো বই, আমি নিই প্লিজ......''

ছেলেটি ভ্রূ কুঁচকে বললেন, ''সেটি হচ্ছে না ম্যাডাম। আমি আগে বলেছি তাই বইটি আমিই নেব। আর অনলাইনে বইটি 'আউট অফ স্টক'... আমি দেখেছিলাম। তাছাড়া, আপনি অনলাইনে নিন না..!

মেয়েটি ভেবেছিলো ছেলেটিকে একটু নরম সুরে বললেই হয়ত অন্য পাঁচজনের মতো গলে যাবে কিন্তু ছেলেটি গললোই না। মেয়েটি মনে মনে ভাবলো, ''কি ঝগড়ুটে ছেলে রে বাবা!'' কিন্তু মেয়েটিও ছেড়ে দেওয়ার পাত্রী নয়, তাই সে ছেলেটির দিকে দৃঢ় দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো, ''আমি আগে বলেছি, আপনি নন। তাই বইটি আমার প্রাপ্য।'' তারপর সমীরবাবুকে বললেন, ''দাদা, বইটি আমাকে দিন।'' কিন্তু ছেলেটিও ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নয়। চলতে থাকলো আবার তর্ক যুদ্ধ ......।

অবশেষে বাধ্য হয়ে সমীরবাবু বললেন, ''তাহলে একটা কাজ করো, এই একটা বই তোমরা ফিফটি ফিফটি করে নাও। তুমি এক সপ্তাহ রাখবে আর তার পরের সপ্তাহ আরেকজন রাখবে।''

দু'জনে একটু ভেবে নিয়ে বললেন, ''তাহলে কে আগে রাখবে?''

সমীরবাবু একটু সমস্যায় পড়লেও সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি খাটিয়ে বললেন, ''লেডিস ফার্স্ট।'' মেয়েটির দিকে বইটি এগিয়ে দিয়ে বললেন, ''তুমি প্রথমে নেবে''।

মেয়েটি মনে মনে খুশি হলেও এটা ভেবে একটু দুঃখ হলো যে এক সপ্তাহ পরে আবার ছেলেটিকে দিয়ে দিতে হবে। যাই হোক, নেই মামার থেকে কানা মামা ভালো।

মেয়েটির ভাবনায় ঢিল ছুড়ে ছেলেটি বললেন, ''আপনার নম্বরটা দেবেন। এক সপ্তাহ পরে কাজে লাগবে।'' মেয়েটি নম্বরটা দিল। ছেলেটি শক্ত কণ্ঠে বললেন, ''কি নামে সেভ করবো?'' মেয়েটিও একইভাবে বললেন, ''সুদীপ্তা, সুদীপ্তা সেন।'' ছেলেটি নম্বরটি সেভ করে বললেন, ''মিসডকল্ দিচ্ছি, আমার শেষে আটত্রিশ।'' মেয়েটির ফোনে একটু রবীন্দ্র সংগীত বেজেই বন্ধ হয়ে গেল। মেয়েটি বললো, ''আপনার নামটি কি নামে সেভ করবো?'' ছেলেটি বললো, ''সঞ্জু, সঞ্জু রায়।

তারপর দু'জনে মিলে টাকা শোধ করে বেরিয়ে পড়লেন দু'দিকে।

চলুন, আপনাদের সঙ্গে সুদীপ্তা আর সঞ্জু'র পরিচয় করিয়ে দি।

সুদীপ্তা সেন, দেখতে বেশ সুন্দর। ছিমছিমে চেহারার মধ্যেও শরীরের গঠন একদম পারফেক্ট। চোখ দুটো অনেকটা সুচিত্রা সেনের মতো, টানা টানা। ঐ চোখে একরাশ ভালোবাসা আছে। জীবনে বহু প্রেমের প্রস্তাব পেয়েছে কিন্তু কখনও কোনো প্রস্তাব গ্রহণ করেননি। এটা ওর অহংকার নয়। ও সবসময় চাই, এমন একটা ছেলে যার দেখতে সুন্দর না হলেও চলবে তবে মনটা যেন খুব সুন্দর হয় যেন তার হৃদয় জুড়ে শুধুই সুদীপ্তার বসবাস। আর একটা বিশেষ দাবি আছে সুদীপ্তা'র, ছেলেটি যেন গান গাইতে পারে।

আর অন্যদিকে সঞ্জু রায় দেখতে মোটামুটি। না বিশাল সুন্দর নয়। সামান্য রঙে চাপা তবে চোখ মুখের গঠনটা খুব সুন্দর। সঞ্জু হাসলে দুটো গজ দাঁত ওকে সৌন্দর্যের অন্য মাত্রায় নিয়ে যাই। তবে হ্যাঁ, সঞ্জু কখনও প্রেমে পড়েনি, মেয়েদের দিকে কখনও ফিরেও তাকায় না। পড়াশোনা নিয়ে থাকতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে, অবসরে গান শুনতে খুব পছন্দ করে। আর একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য, সঞ্জু মায়ের খুব বাধ্য ছেলে।

আরও বেশ কয়েকটি বই কিনে সঞ্জু ট্রেনে করে বাড়ি ফিরছে। ঘন্টা দুয়ের রাস্তা। রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি', 'শেষের কবিতা' বর্তমানের লেখক সায়ক আমানের 'ভাসান বাড়ি' অর্পিতা সরকারের 'অনুভবে তুমি' সহ মোট বারোটি বই কিনেছে। এর মধ্যে বেশ কিছু বই আছে বই যা সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে।

প্রেম, জীবনে সবার আসে। একটা সময় পরে মনে হয়, মা বাবা ছাড়াও জীবনে আরও একটা মানুষ থাকা খুব প্রয়োজন যে মানুষটার সাথে সেইসব কথা শেয়ার করতে পারব যেগুলো মা বাবার সাথে বলা যায় না। হয়ত একটা মানুষ থাকাটা সত্যি খুব প্রয়োজন যে মানুষটা বিপদে বন্ধুর মতো পাশে থাকবে, হাত বাড়িয়ে দেবে, একটু ভালোবাসার মন্ত্র উচ্চারণ শেখাবে। হয়ত এটা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। আর এর সূত্রপাত, প্রেমের উপন্যাস, ভালোবাসার উপন্যাস পড়ে। হয়ত সঞ্জু বা সুদীপ্তা এই পথেই হেঁটে চলছে।

হঠাৎই সঞ্জুর ফোনটা বেজে উঠল। মায়ের ফোন ......

— কি ব্যাপার! কোথায় আছিস এখন?

— এই তো মা, ট্রেনে আছি। এখন সাড়ে পাঁচটা বাজে, সাতটার মধ্যে পৌঁছে যাব।

— ঠিক আছে। সাবধানে আয়। রাখছি।

মায়ের ফোনটা রাখতেই সঞ্জুর মনে হল, এই সময়টা যদি একটা প্রেমিকা থাকত তাহলে গল্প করতে করতে যেতে পারতাম। কত গল্প, কত আবেগ, সব এক নিমেষে বলে দিতাম। এসব ভাবতে ভাবতে সঞ্জু চোখটা বন্ধ করলো। জানালার ধারে বসেছে। বাইরের

ফুরফুরে ঠান্ডা বাতাস সঞ্জুর ফুসফুসের প্রতিটি প্রেম কণাকে যেন চাঙ্গা করে তুললো। দু'চোখ বুজতেই ভেসে উঠল, কলেজ স্ট্রিটের সেই কলরব। কথা কাটাকাটি, তর্ক, ঝগড়া ......। সঞ্জু হাসি পেল আবার খারাপও লাগলো। কত'টা নীচ মানসিকতার কাজ করলো আজকেও। আচ্ছা, এ কথা মাকে বললে, মা কি খুব বকবে... ! হয়ত বকবে...... ! না থাক, মাকে বলব না। সত্যি তো, আরও কিছুদিন অপেক্ষা করলে তো অনলাইনে আবার পাওয়া যেত। তাহলে ......

আচ্ছা, সঞ্জু তো বাড়িতে মা'কে কখনও মিথ্যা বলেনি তাহলে আজ কেন এত সহজে এ কথা মাকে না জানানোর সিদ্ধান্ত নিল !

এত 'কেন' প্রশ্নের সঠিক উত্তর, একটাও সঞ্জুর কাছে নেই। সঞ্জু, এসব কি ভাবছে, বাধ্য হয়ে সঞ্জু চোখটা খুললো। ট্রেনের ভিড়টা অনেক কমেছে। সঞ্জু হেড ফোনটা বের করে কানে গুঁজে আবার চোখ বুজে 'প্রেম ডট কম' শুনতে শুনতে যেন অন্য জগতে হারিয়ে গেল। যেখানে শুধু প্রেম, প্রেমিক আর প্রেমিকা ...... সবাই যেন ওর দিকে তাকিয়ে বলছে, 'তুমিও আমাদের দলে বারবার ......', 'আবার কেউ বলছে,' 'প্রেমে পড়া বারণ, কারণে অকারণ......'। একটা আতঙ্কের সঙ্গেই সঞ্জু চোখটা খুলে দেখলো ট্রেন মধ্যমপুর স্টেশনে। আর একটা স্টেশন পরেই টাকি যেখানে সঞ্জু নামবে। তাড়াতাড়ি ব্যাগপত্র গুছিয়ে নিল সঞ্জু।

ট্রেন থেকে নেমে টোটো ধরে বাড়ি ফিরলো সঞ্জু।

হাত মুখ ধুয়ে, খাওয়া দাওয়া করে, একটু গল্পগুজব করে সঞ্জু বিছানায় গেল। কিন্তু সত্যি সত্যি কথাটা মাকে গোপন করে গেল। এমনটা আগে কখনও করিনি সঞ্জু।

অনেকক্ষণ ধরে চোখ বন্ধ করেও যখন ঘুমের বদলে শুধু কলেজ স্ট্রিটের ঘটনা ভেসে উঠছে, ভেসে উঠছে একটা মিষ্টি মুখ, সেই কাজল কালো চোখ, সেই কন্ঠ সেই নাম সুদীপ্তা। সঞ্জুর ভাবতে ভালো লাগছে, কিন্তু ও ভাবতে চাইছে না। তবুও বারবার যেন সেই নরম কণ্ঠে, 'প্লিজ ......'। এই মুহূর্তে সঞ্জু ঠিক কি করবে বুঝতে না পেরে, জোর করে চোখ বন্ধ করে ঘুমানোর চেষ্টা করলো। ঘড়িতে এগারোটা বাজলো। কিন্তু ঘুম তো এলে না বরং মনে পড়লো সেই ফোন নম্বর। সঞ্জু তাড়াতাড়ি ফোনটা আনলক করে দেখলো ঐ নম্বরে কোনো WhatsApp আছে কিনা। হ্যাঁ, আছে। ডিপিটা সুদীপ্তা'র। সঞ্জু অনেকক্ষণ ধরে দেখলো ডিপিটা। তারপর মুচকি একটা হাসি। লাস্ট সিন, দশটা দুই। আরও কি সব ভাবতে ভাবতে সঞ্জু ঘুমিয়ে পড়লো।

পরের দিন মায়ের ডাকে ঘুম ভাঙলো। ফোনটা আনলক করতেই প্রথমেই সুদীপ্তা'র সেই ডিপিটা। মা বেড টি দিয়ে বললো, ''অনেকবেলা হয়ে গেছে। গুছিয়ে এসো, সকালের জল খাবার টেবিলে রাখা আছে, খেয়ে নাও।'' সঞ্জুর আবার খারাপ লাগলো কালকে সুদীপ্তা'র সাথে ঐ ব্যবহারে। অনেক ভেবে চিন্তে ঠিক করলো আজ সরি বলে দেবে। কিন্তু কীভাবে বলবে, WhatsApp এ বলবে না হয় ...... এসব সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে সকালের খাবার খেতে বসলো। আবার চেক করে দেখলো সুদীপ্তা'র লাস্ট সিন নয়টা পনেরো। মাত্র কয়েক মিনিট আগে ...... এই সুযোগ, সঞ্জু এস এম এস করলো,

— সরি, সরি

কিছুক্ষণ পর সুদীপ্তা (অবাক করা) ইমোজি দিয়ে লিখলো,

— কেন ?

— গতকাল আপনার সঙ্গে অত ভিড়ের মধ্যে অমনটা করা উচিত হয়নি।

সুদীপ্তা যেন একটু অপ্রস্তুত হয়েই লজ্জার ইমোজি পাঠাল। তারপর লিখলো,

— ইট'স ওকে। এখন কলেজ যাব পরে কথা হবে।

— আপনার কোন কলেজ ?

প্রশ্নটা করে সঞ্জু বারবার ফোটা চেক করলো দুটো নীল দাগের জন্য। প্রায় তিরিশ মিনিট পর উত্তর এলো,

— প্রথমত বলি, আপনি করে বলার প্রয়োজন নেই। আর দ্বিতীয়ত, আমার প্রেসিডেন্সি কলেজ

সঞ্জু ভাবলো, সুদীপ্তা ওকে হয়ত এই প্রশ্নটাই পাল্টা করবে কিন্তু করলো না। তখন বাধ্য হয়ে সঞ্জু লিখলো,

— আমার টাকি গর্ভমেন্ট কলেজ, ফিজিক্স অনার্স থার্ড ইয়ার করছি।

— আচ্ছা বেশ।

— তোমার বিষয় কি?

— জিওগ্রাফি, থার্ড ইয়ার চলছে আমারও।

সঞ্জু দুটো হাসির ইমোজি পাঠিয়ে লিখলো,

— বাহ দারুন তো!

সঞ্জু লিখে আবার ডিলিট করে দিল, তুমি কি কলেজ পৌঁচেছো?

বেশি কথা বললো না সঞ্জু। একেবারে বেশি কথা বললে ভাববে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি।

আচ্ছা, সঞ্জু, সুদীপ্তা সম্পর্কে জানতে এতটা আগ্রহী কেন? সঞ্জু কি তাহলে সুদীপ্তার উপর দুর্বল হয়ে পড়ছে। কেন জানে না সঞ্জু, তবে ওর মধ্যে যেন কেমন একটা ফিল হচ্ছে। ও বুঝতে পারছে না, ধরতে পারছে না সেই অনুভূতিটা। আচ্ছা, প্রেমে পড়লে কি এমনটা হয়। মাকে জিজ্ঞাসা করবে! না থাক, এসব বোধ হয় মাকে বলতে নেই।

এরপরে আরও অনেক কথা হয়েছিল সঞ্জুর, সুদীপ্তা'র সাথে। সুদীপ্তার পছন্দ, অপছন্দ, ভালো লাগা সবকিছু গল্পে গল্পে সঞ্জু জেনে নিয়েছিল। সুদীপ্তাও কিছু কিছু জেনে নিয়েছিল পাল্টা প্রশ্ন করে।

সুদীপ্তা কলকাতার দক্ষিণে কোথাও থাকে, এমনটাই বলেছিল সঞ্জুকে। কিন্তু সুদীপ্তা হোস্টেলে থাকে বলেছিল। বাড়িতে মাসে একবার যাই। আর সঞ্জুর ঠিকানাও জানতে চেয়েছিল।

এভাবেই এক সপ্তাহ পূর্ণ হল। দু'জনের পুনরায় দেখা হল একটা পার্কে।

বই বিনিময়ের পাশাপাশি দু'জনের আরও কিছুটা গল্প হল। পরিচয় হল আরও খানিকটা। অবশেষে দু'জন ভালো বন্ধু হল। কিন্তু সঞ্জুর মনে হল, আর কবে দেখা হবে আমাদের? এমনটি মুখ ফুটে বেরিয়ে এলো প্রশ্নটা। একটা ভয় কাজ করছে সঞ্জুর, যদি আর দেখা না হয়। প্রশ্নটা সুদীপ্তা কি শুনতে পায়নি! একটু ভাবলো সঞ্জু। সঞ্জু এটুকু বুঝতে পারলো, সুদীপ্তা ওর একটা বন্ধু হিসেবে মেনে নিয়ে, এই ক'দিনে। সুদীপ্তা চলে গেল। সঞ্জু একা, হঠাৎ মনে হল, এই পৃথিবীতে এই মুহূর্তে ও সম্পূর্ণ একা। একটু আগে কেন এমনটা মনে হয়নি!

বেশ কয়েকদিন ধরে, সঞ্জু নিজে থেকেই প্রথমে এস এম এস করছে। সুদীপ্তা রিপ্লাই দেয় প্রতিটি এস এম এসে কিন্তু নিজে খুব একটা প্রশ্ন করে না। সঞ্জুর একটা গান গাইতে খুব ইচ্ছে হচ্ছে, 'একবার বল নেই, তোর কেউ নেই, কেউ নেই।' সঞ্জু হঠাৎ ভাবলো, আচ্ছা, সুদীপ্তা নিজে খুব একটা এস এম এস করে না কেন? সুদীপ্তা কি আগে কারোর সঙ্গে সম্পর্কে ছিল? কিন্তু নিজেই নিজের মনকে বুঝিয়ে দিল।

একদিন হঠাৎ, সঞ্জু অনেক সাহস নিয়ে লিখেই ফেললো,

— তোমার সাথে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা ছিল?

— কি কথা ?

— কীভাবে বলি বলো তো !

— মনের কথা চেপে রেখো না। কষ্ট হবে।

— তাহলে বলি বরং ......

অল্প কিছুক্ষণ পর সঞ্জু আবার লিখলো,

— আগে বলো, কখনও বন্ধুত্ব নষ্ট করবে না।

— আচ্ছা বেশ। তাই হবে। বলো দেখি, কি বলবে। এত কথা আদায় করা উচিত নয়।

— সরি, বলছি এবার ......

আমি তোমায় ভালোবেসে ফেলেছি। বিশ্বাস করো, এই প্রথমবার আমি অনুভব করতে পারলাম যে আমি তোমায় ভালোবেসে ফেলেছি।

সঞ্জুর বুকে ভেতর ধড়ফড় করতে লাগলো। কিছুক্ষণ পর রিপ্লাই এলো,

— বন্ধু হয়ে পাশে থাকবো, কথা দিলাম।

অগত্যা বাধ্য হয়েই সঞ্জু লিখলো,

— বেশ তাই হোক। আমার ভালোবাসা অপেক্ষার অন্তরালে থেকে যাক।

মানুষ প্রথম প্রেমে পড়ে ছেঁকা খেলে কবিতা লেখে আর কবি হয়। এতদিন সঞ্জু এসব মানত না। সঞ্জুও কিন্তু এখন কবিতা লেখে। একবার তো সুদীপ্তা'কে সত্যি সত্যি পাঠিয়ে দিল,

'আমার নাছোড়বান্দা প্রেমকণাগুলো ফুসফুস শ্বাসরুদ্ধ করতে চাইছে

ভেঙে পড়ে যেতে চাইছে আমার সেই স্বপ্নের তাসের ঘর,

লুটোপুটি খাচ্ছে, একদল বিচ্ছিরি রকমের এলোপাথারি রং মাখা স্বপ্ন

ভুলে যেতে বসেছে এই পৃথিবীতে কে বা আপন আর কে বা পর !

......'

মাস খানেক কেটে গেল। প্রতিনিয়ত কথা হয় সঞ্জুর সাথে সুদীপ্তার। কখনও প্রসঙ্গ 'হলুদ বসন্ত' কখনও 'ভাসান বাড়ি' আবার কখনও 'চোখের বালি' আবার কখনও সুদীপ্তার প্রিয় 'দেবদাস', 'পল্লীসমাজ' ইত্যাদি ইত্যাদি।

এতদিনে সুদীপ্তা অনুভব করলো, ও যেন সঞ্জুকে ভালোবেসে ফেলছে। ও আগে বহু প্রেমের প্রস্তাব পেলেও, কখনও, তারপরে, সেই ছেলের সঙ্গে আর কথা বলেনি। কিন্তু কেন জানে না সুদীপ্তা, সঞ্জুর সাথে এত কথা কেন বলছে ? ও যেন ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ছে সঞ্জুর উপরে। একটু অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে দিনের পর দিন। একদিন, সঞ্জু যখন আবার সেই পার্কে দেখা করার কথা বলে সুদীপ্তা সাত পাঁচ না ভেবেই রাজি হয়ে যায়। আচ্ছা, এজন্যই, সবাই বলে, প্রেমে পড়লে মানুষ অন্ধ হয়ে যায়। সুদীপ্তা অনুভব

করলো, ও স্বাভাবিক চিন্তা ভাবনা থেকে অনেক দূরে ছিটকে পড়ে যাচ্ছে।

দ্বিতীয় বার দেখা হল, সঞ্জু আর সুদীপ্তা'র সেই পার্কে ......

আজ আর আদ্যপান্থ না ভেবে সঞ্জুবলেই বসলো, ''আমি তোকে খুব ভালোবেসে ফেলছি। প্লিজ না বলিস না। আমার বিশ্বাস তুইও আমাকে ভালোবাসিস। একটু চোখটা বন্ধ কর, দেখ প্রথমে আমার ছবিই তোর মনের দর্পণে দেখতে পাবি।

সুদীপ্তা চোখ বন্ধ করলো। সত্যি তাই, সঞ্জু ঠিক বলেছে।

এতদিনে আপনি থেকে তুমি থেকে ওদের সম্পর্ক এখন তুইতে নেমেছে।

তারপর এক সঙ্গে রেস্টুরেন্ট, সিনেমা হল, কত গল্প, কত পার্ক যে তারা ঘুরলো এই একটা বছরে তার শেষ নেই। একসাথে বৃষ্টিতে ভেজা, এই ছাতার তলায় বসে গল্প করা ......

একদিন হঠাৎ সুদীপ্তার মনে হল, ওর সাথে সঞ্জুর মতের বহু অমিল। হয়ত এই সম্পর্কটা একপ্রকার জোরপূর্বক বা কম বুদ্ধির ফসল। তাই বাধ্য হয়েই দুজনের কষ্ট হবে জেনেও সুদীপ্তা সঞ্জুকে লিখলো,

— একটা কথা বলছি, কিছু মনে করিস না। আমার মনে হয় এই সম্পর্কটা বেশি দূর এগোনোটা ঠিক হবে না। আমার আর তোর সব বিষয়ে মতে সম্পূর্ণ অমিল। আর সেইজন্যই, তুই আমাকে মাঝে মাঝে আমার ড্রেস সাজেস্ট করি, তোর পছন্দ চুরিদার আর আমার পছন্দ জিন্স টপ, তোর পছন্দ লাল লিপস্টিক কিন্তু আমার পছন্দ হালকা গোলাপি, আর তোর পছন্দ গান, আমার পছন্দ গায়ক, তুই আনন্দ, আড্ডা পছন্দ করিস না, কিন্তু আমি এগুলো পছন্দ করি ...... এছাড়াও আরও কত বিষয়। তোর চোখে এগুলো খারাপ হতে পারে কিন্তু আমার চোখে এগুলো ভালো লাগা। তোর জন্য আমি আমার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন করতে পারবো না। আমি নিজেকে ভেঙে চুরমার করতে পারবো না। আমি আর পেরে উঠছি না সঞ্জু। আর পেরে উঠছি না, হাফিয়ে যাচ্ছি তোর নির্দেশনায় চলতে চলতে ...... আমারও তো একটু মুক্তি চাই বল। আমি দু'জনের ভালোর জন্য বলছি, দুটো মানুষের মনের মিল না থাকলে কখনও জীবনের পথে এগিয়ে যাওয়া যাই না। প্লিজ, কিছু মনে করিস না। আজ বাধ্য হয়ে দূরত্ব চাইছি। আমি জানি, তুই আমায় ভুল বুঝবি ... আর সেটাই স্বাভাবিক।

সঞ্জু আর কিছুই লিখতে পারলো না। শুধু চোখ থেকে দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে এলো চিবুকের কাছে। একটা কথা লিখেও মুছে দিল, 'কিছুই কি করা যায় না সুদীপ্তা!'

এ প্রশ্নের উত্তর সঞ্জুর জানা। সঞ্জু'র এখন নিজেকে ভেঙে চুরমার করে নিজের খারাপলাগাগুলোকে ভালো লাগাতে হবে। সেটা কি সঞ্জু পারবে নাকি সেটা ঠিক কাজ হবে! সঞ্জু কিছু জানে না, তবে এটুকু জানে, 'ভালোবাসা-ভালোবাসি' খেলায় যন্ত্রণাটা একটা শেষ পদক্ষেপের মতো। এটাকে টপকাতে পারলে তুমি জিতে যাবে আর না পারলে নিঃসঙ্গতা তোমায় ভালোবাসবে। রবি ঠাকুরের একটা গান সঞ্জুর মনে পড়লো,

''সখী, ভাবনা কাহারে বলে।
সখী, যাতনা কাহারে বলে।
তোমরা যে বলো দিবস-রজনী,
'ভালোবাসা' 'ভালোবাসা'—
সখী, ভালোবাসা কারে কয়!
সে কি কেবলই যাতনাময়।......''

সমাপ্ত

মূল্যবান সময়

নাসিফা খাতুন
৫ম সেমেস্টার, ভূগোল বিভাগ (অনার্স)

''অবশ্যই নিজেকে সময় দাও
কারণ তোমার প্রথম প্রয়োজন তুমি নিজে''

কেন এই কথাটি বললাম? চলো তোমাদের সাথে একটা ঘটনা শেয়ার করি ...,

একবার এক কৃষকের একটি ঘড়ি হারিয়ে গেল। যদিও ঘড়িটি অনেক দামি ছিল না তবুও কৃষকের খুব প্রিয় ছিল। কৃষক খুব উন্মাদ হয়ে ঘড়িটি খুঁজছে, তাঁর অনুমান ছিল ঘড়িটি তার ঘরেই আছে, কিন্তু কোথায়? কোনোভাবেই সে পাচ্ছে না। কৃষক খুব দুঃখী হয়ে বসে পড়লো।

কৃষকের একটি ছেলে ছিল। বয়স বছর আটেক হবে। ছেলেটি তার খেলার সঙ্গীদের নিয়ে উঠোনে খেলা করছিল। বাবাকে এভাবে বসে থাকতে দেখে ছেলেটা ও তার সঙ্গীরা ছুটে এসে জিজ্ঞাসা করলো, বাবা কী হয়েছে? বাবা বললো তোমার মায়ের দেওয়া শেষ স্মৃতিটুকুও আমি মনে হয় হারিয়ে ফেলেছি। ছেলে তো কিছুই বুঝলো না, বললো বাবা কি হারিয়েছো? কি পাচ্ছনা? কৃষক বাবা কাঁদো কাঁদো হয়ে বললো আমার ঘড়িটা পাচ্ছি না।

তখন সব বাচ্ছারা মিলে বললো আমরা খুঁজবো? তখন বাবা একটু শান্ত হয়ে বললো যে খুঁজে দিতে পারবে তাকে একটা চকলেট দেব! বাচ্ছারাও খুব খুশি হয়ে খুঁজতে লাগলো।

কিছুক্ষণ পর সবাই নিরাশ মুখে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো, কেউ খুঁজে পেলনা। এমন সময় একটা ছোট্ট বালক বললো, কাকা আমি আর একবার খুঁজতে চাই কিন্তু এবার আমি একাই খুঁজবো। চাষিও কোনো উপায় না পেয়ে বললো, হ্যাঁ ঠিক আছে খোঁজো। বেশ কিছুক্ষণ পর সেই ছোট্ট বাচ্ছাটি ঘড়ি হাতে নিয়ে ঘর থেকে বাইরে এলো। কৃষকতো আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলো, চেহারা খুশিতে ভরে উঠলো। কৃষক বাচ্ছাটিকে বললো তুমি ঘরে গিয়ে এমন কি যাদু করলে যে ঘড়ি কেউ পেল না আর তুমি একা গিয়েই পেয়ে গেলে। বাচ্ছাটি হাসতে হাসতে উত্তর দিল কাকা আমি কোনো যাদু করিনি, আমি ঘরে গিয়ে চুপচাপ শান্তিতে মেঝের উপর চোখ বন্ধ করে বসে পড়লাম, যেহেতু ওখানে আর কেউ ছিলনা তাই অন্য কোনো আওয়াজও ছিল না। আমার ধ্যান একাগ্রতা দিয়ে ঘড়ির আওয়াজ শোনার চেষ্টা করছিলাম। আর তারপরই আলমারির পিছন থেকে টিক টিক আওয়াজ শুনতে পেলাম। আর খুঁজে পেয়ে গেলাম।

কৃষকতো খুশি হয়ে একটা নয় দুটি চকলেট দিল বাচ্ছাটিকে। তাহলে এই ঘটনাটি থেকে শেখার বিষয় কী হল? ''শান্তি'' শুধু হারিয়ে যাওয়া জিনিস খুঁজতে নয়, আমাদের জীবনের এখন অনেক সমস্যা বা প্রশ্নের উত্তর আমাদের মন দিতে পারে। তারজন্য প্রয়োজন মানসিক শান্তি। আর এই মানসিক শান্তি পেতে হলে প্রত্যেক দিন নিজেকে একটু হলেও সময় দিতে হবে। যে সময় নিজেই নিজের একমাত্র সঙ্গী থাকবে। আর কেউ নয়।

শান্তিতে, কোনোরকম Stress ছাড়াই নিজের সঙ্গে কাটানো এই সময় দিনের সবথেকে মূল্যবান সময় হবে। আর তোমার জীবনের অনেক সমস্যার সমাধান খুঁজে পেয়ে যাবে। মনে রাখবে তোমার সমস্যার সবথেকে বড়ো সমাধানকারী তুমি নিজে। এজন্য নিজেকে সময় দেওয়া শুরু করো।

সোনা নাপিতের সেলুন

হাসানুজ্জামান সরদার
১ম সেমেস্টার, গণিত বিভাগ (অনার্স)

অনেকদিন পর আজ দিনটি রোদ ঝলমলে, মনটাও বেশ ফুরফুরে আছে কিন্তু তার কারণ এই মৃদুমন্দ পরিবেশ নয়। আসলে আজ অনেকদিন পর দাদুর সাথে চুল কাটতে যাচ্ছি আমাদের বাজারে। দাদুর হাত ধরে বাজারে প্রবেশ করার পর দাদু প্রথমে কিছু লজেন্স কিনে দিলেন, আর বললেন 'চুলকাটার সময় যেন একদম কাঁদবি না'। কিন্তু আমার তো চুল কাটতে বেশ লাগে। দাদু এক দোকানে নিয়ে গেলেন বোর্ডে নাম লেখা 'সোনা নাপিতের সেলুন'। ঢুকতেই টের পেলাম কি প্রচণ্ড ভিড় সেখানে। তাছাড়া রয়েছে বিচিত্র সব ব্যক্তির বিচিত্র সব আবদার যেমন কেউ বলছে আমার বাড়ি আত্মীয় এসেছে তাই চুলটা একটু আগে কেটে দিতে, কেউ বলছে তার চুল যেন ভালো করে কাটা হয়। আর কেউ চুলে পাক ধরায় কলপ করে দিতে বলছেন। কিন্তু যাইহোক এত সবকিছুর পর আমার পালা যখন এল তখন তিনি চেয়ারের উপরে একটি টুল দিয়ে তার উপরে আমাকে বসালেন এবং গায়ে কাপড় জড়িয়ে দেওয়ার সময় বললেন 'খোকা, চুল কাটার সময় যেন মাথা নাড়াবে না'। সেইদিন চুল কেটে মনের আনন্দে দাদুর দেওয়া লজেন্স খেতে খেতে বাড়ি এসেছিলাম। তারপর অনেক বার গিয়েছি তাঁর দোকানে। বাবার সাথে তার ভালোই খাতির জমেছিল কারণ তিনিই হচ্ছেন খুব বদ মেজাজের লোক। আমি তাকে 'সোনা দাদু' বলে ডাকতাম। তার পরে সময়ের সাথে সাথে প্রাইমারি স্কুলের গণ্ডি পার হয়ে আমি ভর্তি হলাম হাইস্কুলে। আমাদের বাড়িটা একটু গ্রামের দিকে হওয়ায় তেমন ভালো স্কুল ছিল না। তাই বাবা দূরে শহরে এক হাইস্কুলে ভর্তি করল আমাকে। সুতরাং গরমের ছুটি আর পালা পার্বন ছাড়া বাড়ি আসা হয় না। স্কুল শেষ করে ভালো র‍্যাঙ্ক নিয়ে চলে গেলাম ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে, এর মধ্যে চেহারা ও উচ্চতায় বদল এসেছে, কিছু নতুন বন্ধুবান্ধব তৈরি হয়েছে আর সবথেকে দুঃখের কথা দাদু দিদা গত হয়েছেন। তারপর পড়া শেষ হলে বাড়ি ফিরে এলাম। প্রথম প্রথম বাড়ি এসে কিছুদিন অলস ভাবে কাটল। একদিন মা বাজার থেকে টুকিটাকি জিনিস আনতে বলল। বাজারে প্রবেশ করেই চোখে পড়ল পুরানো স্মৃতির সাথে বর্তমান অবস্থার কী ভীষণ ফারাক! বাজার সামনের মিষ্টির দোকানটা আগের থেকে আরও আয়তনে বেড়েছে এবং বেড়েছে বেচাকেনা। কত নতুন নতুন দোকান জায়গা করে নিয়েছে। বাজারের সবজি বিক্রেতারা কেউ কেউ রাস্তার ধারেও উঠে এসেছে। যেতে যেতে হঠাৎ চোখে পড়ল এতসব নতুনতার মাঝে একটি মাত্র পুরানো জিনিস। আমাদের সেই সোনার দাদুর দোকান। দোকান ঘরটি বর্তমানে খুবই জরাজীর্ণ অবস্থা। জানালার পাল্লাগুলি ভেঙে গিয়েছে, দোকানটির দেওয়ালে ছোটো ছোটো ফাটল এবং মাঝে মাঝে প্লাস্টার খসে গিয়ে ইট ও সুরকি বেরিয়ে পড়েছে। কাঁচগুলিও এখন বিশেষ স্বচ্ছ নয়। তার মাঝে দেখলাম সোনা দাদুকে একটি ছেঁড়া চাদর গায়ে শীর্ণ দেহে বসে আছেন একটি বেঞ্চের উপরে। প্রাচীনতা তার চেহারায়ও ধরা দিয়েছে, চুলগুলি প্রায় সম্পূর্ণ সাদা, মুখটা তুবড়ে গিয়েছে। শীর্ণকায় দেহ নিয়ে মুখ্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন বাজারে ভিড় করা মানুষদের দিকে। সেই দৃষ্টিতে শূন্যতা এমন ভাবে মিশে আছে যাতে ভিতরের অভিব্যাক্তি সম্পূর্ণ না হলেও কিছুটা প্রকাশ পায়। এত সব ব্যস্ততার মাঝে সময় যেন এখানে স্তব্ধ। এই সব দেখতে দেখতে এক ঘোরের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলাম। বাজার করতে আসা এক ব্যক্তির অনিচ্ছাকৃত ধাক্কায় হুশ ফিরল। এগোবার ইচ্ছা হল না। কারণ দৃশ্যটা বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারতাম না হয়ত। জিনিস পত্র কেনার সময় দোকানদারের কাছে জানতে চাইলে উনি বললেন 'ওই বুড়ো নাপিত তো; আরে সেতো চোখে ভালো দেখতে পায়না, তাছাড়া এখনো সেই তেকেলে ভাবে চুল কাটে, তা কেউ যায় ওখানে!' বুঝলাম এখনকার উশৃঙ্খল যুবকদের 'নতুন নতুন ফ্যাশান ও স্টাইলের প্রয়োজন মেটাতে তিনি অপারগ। তাই তার সারা দিনটাই কেটে যায় বাজারে আসা ব্যস্ত মানুষ ও কর্মরত পড়শি দোকানগুলি দেখতে দেখতে এবং সবশেষে তিনি তার পুরানো দিনগুলির কথা মনে করতে করতে হতাশ মনে বাড়ি ফেরেন। সেই দিন বাড়ি ফিরে সারাদিন কোনো কিছুই আর ভালো লাগছিল না। কিছুদিনের মধ্যে এই বিষণ্ণ ভাবটি চলে গেল। মাসদুয়েক কেটে গেল তারপর একদিন দেখলাম দাদুর সেই দোকানটি ভেঙে নতুন করে দোকান তৈরি হচ্ছে। পরে জানতে পারি যে দাদুর শেষ বয়েসে প্রবল দারিদ্রতা এড়াতে দোকানটি বিক্রি করে দিয়েছেন।। তখন মনে হতে লাগল কতই না স্মৃতি বহন করে চলেছিল সেই দোকান ঘরটি। কিন্তু পুরাতনকে যে সর্বদাই নতুনদের জন্য জায়গা ছেড়ে দিতে হয় তাই আজ তিনি শীত কালে ঝরে পড়া পাতার মতো আমাদের বাজারের বুক থেকে চিরতরে হারিয়ে গিয়েছিলেন।

একটি স্বপ্নের উড়ান

অর্ক মণ্ডল
স্নাতক, গণিত বিভাগ (২০২১)

আজকে আমি তোমাদেরকে এমন এক মেয়ের গল্প শোনাবো যার কাছে দারিদ্রতা অবর্ণনীয় রোগ-যন্ত্রণা কোন কিছুই টিকতে পারেনি তিনি সমগ্র পৃথিবীকে চমকে দিয়ে দু-দুবার নোবেল পেয়েছিলেন এবং এরকম লড়াকু চরিত্রের নারী পৃথিবীর ইতিহাসে আর দুটি আছে কিনা সে ব্যাপারে সন্দেহ হয়। মেয়েটির জন্ম হয় ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দের ৭ই নভেম্বর পোল্যান্ডের এক শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পরিবারে। তার বাবা ছিলেন বিজ্ঞানের শিক্ষক এবং তিনি বেশ কিছুদিন কলেজে অধ্যাপনা করেছিলেন। বাবা-মা ও পাঁচ ভাই-বোনকে নিয়ে বেশ জমজমাট এক সংসার।

প্রতিটি ভাই-বোনই বেশ বুদ্ধিমান বিশেষ করে আমাদের গল্পের নায়িকা স্কুলে সবসময় প্রথম হতো। স্বভাবতই স্কুল শিক্ষক বাবা-মা এবং বড়দিদির সবথেকে আদরের বোন ছিল সে। সবাই তাকে নিয়ে বেশ স্বপ্ন দেখতো যে একদিন সে বিশাল বড় কিছু হবে। যখন তার বয়স মাত্র আট বছর তখন তার দিদি মারা গেল এত ছোট বয়সে মৃত্যুকে প্রথম কাছ থেকে দেখলো সে। এরপর মা থাইসিস রোগে আক্রান্ত হল এই জন্য মেয়েদের দেখাশোনা করা, তাদের কোলে পিঠে নিয়ে আদর করা এইসব থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে হতো মায়ের যে অভাব পূরণ করতেই বড়দিদি এত ছোট বয়সে মারা গেল। এরপর দিদির শোক ভুলতে না ভুলতে তার বয়স যখন মাত্র দশ বছর, তখন তার মা মারা গেল। মা কে সে এ পৃথিবীতে সবথেকে বেশি ভালবাসতো।

সদ্য মৃত মায়ের চোখ ভুলতে গিয়ে স্টাডি রুমে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নানা রকমের বই পড়তো। সময় পেলে মেজ দিদিকে সংসারের কাজে সাহায্য করত। এভাবেই ষোলো বছর বয়সে স্কুলের পরীক্ষায় সোনার মেডেল নিয়ে পাস করে গেল সে। তখনকার দিনে পোল্যাণ্ড ছিল রাশিয়ার দখলে কিন্তু তাদের এই পরিবারের এত দেশপ্রেম ছিল যে তারা কখনোই দুঃশাসনকে মেনে নিতে পারেনি।

সম্ভবত এই কারণেই স্কুলে চাকরি খোয়ালেন মেয়েটির বাবা। ঘরে এতগুলো মানুষ, স্কুল-কলেজ সর্বত্রই তখন রাশিয়ার কড়া খবরদারি। এতগুলো মানুষ খাবে কি করে সেই চিন্তাতেই সোনার মেডেল পাওয়া সোনার মেয়েকেও স্কুল ছাড়তে হলো এবং সেখান থেকে চলে গেল এক অজপাড়াগাঁয়ে আত্মীয়ের বাড়ি। কিন্তু তিনি ভেঙে পড়লেন না। সেই সময়কে কাজে লাগিয়ে শিখে নিলেন কি করে ঘোড়ায় চড়তে হয়, নৌকা চালাতে হয়। ভাগ্যকে দোষ দিলেন না, মেনে নিলেন তাঁর জীবনের কঠোর পরিস্থিতি।

তবে বাবা ও ভাই বোনকে ছেড়ে গ্রামে বেশিদিন থাকতে পারলেন না। বাড়ি ফিরে এসে টিউশনি শুরু করলেন। মাত্র সতেরো বছর বয়সের সুন্দর ফুটফুটে মেয়েটি সারাদিন এই বাড়ি ওই বাড়ি টিউশনি পড়িয়ে বেড়ায়। তার মাইনে যেমন সামান্য, তেমনি খুবই অনিয়মিত, কিছু বলতে গেলেই টিউশনি মাস্টার বিদায়। ধনী ঘরের লোকেরা কতদিন অকারণে তাকে অপমান করে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে, মেয়েটির এতোটুকু ধৈর্যচ্যুতি ঘটে নি। তখনকার দিনে পোল্যাণ্ডে এক ধরনের ভ্রাম্যমাণ পাঠাগার ছিল। যারা খুবই গরীব বা অন্য কোনো কারণে কলেজে পড়তে পারতো না তাদের জন্য এই পাঠাগার খুবই সাহায্য করত। আমাদের গল্পের মেয়েটিও এই ভ্রাম্যমাণ ইউনিভার্সিটি থেকে পড়াশানা চালিয়ে যেতে লাগল। সে স্বপ্ন দেখতো যে সোর্বেন ইউনিভার্সিটি থেকে বিজ্ঞানে উচ্চ শিক্ষা লাভ করবে এবং তারপর দেশে ফিরে বিজ্ঞানের সেবা করবে।

স্বপ্ন দেখতে তার মেয়ে যদিও প্যারিসে গিয়ে ডাক্তারি পড়ার ইচ্ছা তা কিন্তু এত টাকা কোথায়? অসহায় বাবা মেয়েদের এই স্বপ্নের যন্ত্রণা চোখের উপর চেয়ে চেয়ে দেখতেন আর কেঁদে বলতেন ''বুড়ো বাপকে তোরা ক্ষমা করিস মা''। দুই মেয়ে বাবার চোখ মুছিয়ে বলতেন যে দেখো একদিন আমরা আমাদের স্বপ্ন ঠিক পূরণ করব। বাবা বলতেন আমি তোদেরকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করি।

বাবার এই আশীর্বাদ জানো আশ্চর্যভাবে সফল হয়ে গিয়েছিল এই মেয়েটিই এবং তার দিদির জীবনে।

সবার প্রথমে মেয়েটির ঠিক করলেন লোকের বাড়ি গভর্নেন্স এর চাকরি নিয়ে দিদিকে টাকা পাঠাতে থাকবেন। কথ রইল যখন দিদি ডাক্তারি পাস করবে তখন তার টাকায় আমাদের গল্পের মেয়েটি আবার কলেজে ভর্তি হবে এবং শুরু করবে বিজ্ঞান সাধনা। একজন ধনী উকিল এর বাড়ি গভর্নেন্স এর চাকরি নিলেন যার মাইনে ছিল তখনকার দিনে চারশো রুবেল। থাকা-খাওয়া পড়াশোনার সুযোগ নেই। সারাক্ষণ বাড়িতে অতিথি আপ্যায়নের ভিড়। তাকে সবকিছুতেই জোর করে অংশ নিতে হতো। এতটাই বিরক্ত হয়ে গেলেন যে চাকরি ছেড়ে দিলেন। এবার গ্রামে চাকরি মাইনে পাঁচশো রুবেল, এখানে লাইব্রেরী আছে এবং কাজের ফাঁকে লাইব্রেরীতে গিয়ে পড়াশোনা করা যায়।

মেয়েটি সমাজতত্ত্ব এবং পদার্থবিদ্যার বই পড়তে শুরু করলো কোন কঠিন অংক না পারলে বাবাকে চিঠি লিখত বাবা সেই সমাধান বার করে আবার মেয়েকে চিঠি লিখে পাঠিয়ে দিতো। গ্রামে মেয়েটির দেখলো যে ছোট ছোট বাচ্চা ছেলে মেয়েদের পড়াশোনার একদম সুযোগ নেই তাই নিজের চাকরি এবং পড়াশুনার মধ্যেও প্রতিদিন দু'ঘণ্টা করে সময় বার করে ঐ সমস্ত ছেলেমেয়েদের পড়াতে নিজের মাইনে থেকে তাদের খাতাপত্র কিনে দিতেন এবং বাকি টাকা পাঠাতেন বাবা আর দিদিকে। নিজের জন্য কোন বিলাসিতা নেই একেবারে সহজ সরল একটা জীবন। অবশেষে চব্বিশ বছর বয়স যখন তখন জীবনে সুযোগ এলো।

দিদির অর্থের সাহায্যে সরবন ইউনিভার্সিটি তে ভর্তি হয়ে গেলেন। পাস করলেন ফিজিক্সে প্রথম এবং গণিতের দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। বছরে ৬০০ রুবেল স্কলারশিপ। এবার নিশ্চিন্তে একটু গবেষণা করতে হবে কিন্তু কোথাও ভালো ল্যাবরেটরি পায় না যেখানে ইচ্ছা মতো একটু গবেষণা করা যেতে পারে। খুঁজতে খুঁজতে তিনি জানতে পারলেন এক অধ্যাপকের বাড়ি ল্যাব প্রায় খালি পড়ে আছে মেয়েটি তাদের বাড়ী গেলেন এবং অধ্যাপক সানন্দে তাকে স্বাধীনভাবে গবেষণার অনুমতি দিলেন। গবেষণা শেষ করে তিনি বাড়ি ফিরতে চেয়েছিলেন কিন্তু সেই অধ্যাপক তাকে বাধা দিলেন বললেন যে আপনার মত এত উচ্চ প্রতিভাময়ী মানুষের বিজ্ঞানের জন্য কিছু করা উচিত। তাই শেষ পর্যন্ত গরিব অধ্যাপকের সঙ্গে জীবনের গাঁটছাড়া বাঁধলেন গল্পের মেয়েটি।

শুরু হলো জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়। স্বামী আর বৃদ্ধ শ্বশুর কে নিয়ে সংসার। ভোরে উঠে বাজার করা থেকে রান্না করা, ঘরদোর পরিষ্কার করা, জামা কাপড় কাচা, সবই একা করতে হতো তাকে। ঘরের কাজ সেরে ল্যাবরেটরীতে টানা আট ঘণ্টা ধরে প্রতিদিন গবেষণা চলত। এই ল্যাবরেটরির অবস্থা না বললেই নয়। স্কুলের একতলায় ছোট্ট একটা ঘর সেখানে না ঢোকে বাতাস, সরঞ্জাম যা আছে তার অবস্থা আরও শোচনীয়।

তবুও যে বলেছিলাম পৃথিবীর কোন কিছুই তাকে হারাতে পারেনি এই ছোট্ট ঘর থেকেই তিনি পেয়েছিলেন বিশ্বজয়ের মুকুট ততদিনে তার সংসারে আরো দুজন ছোট অতিথি এসেছে। দুটো ফুটফুটে মেয়ে। এর মধ্যে বড় মেয়ে ভবিষ্যতে আর এক নোবেল বিজয়ীনী। এতক্ষণ নিশ্চয় পড়ে তোমরা বুঝতে পেরেছো আমি কারো গল্প বলছি। আমাদের গল্পের নায়িকা হলো মেরি কুরী। ১৯০৩ সালে তিনি এবং তার স্বামী নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন যৌথভাবে কিন্তু কিভাবে পেয়েছিলেন সেই গল্পটা আর একটু বলি।

তখন তারা এক্স রশ্মি নিয়ে গবেষণা করছিলেন। কিছুদিন গবেষণার পর দেখলেন যদি ইউরোনিয়াম বেশি থাকে, রশ্মির তীব্রতা বেশি হয়; তাই তারা ইউরেনিয়াম নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করলেন। আরো জানতে পারলেন যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে রশ্মি খুব বেশি পরিমাণে বের হচ্ছে, দশবার পরীক্ষা হল এবং প্রত্যেকবারই একই রেজাল্ট। এত রশ্মি আসে কোথা থেকে ?

বলছিলেন খনি থেকে ইউরেনিয়াম তোলার সময় বেশ কিছু জিনিস তার সঙ্গে নিশ্চয়ই মিশে গেছে। হল আবার গবেষণা। ইউরেনিয়ামের ডালা নিয়ে আলাদা আলাদা ভাগ করে ফেলা হল দেখা গেল যে চেনা এলিমেন্ট ছাড়াও দুটি নতুন বস্তু আছে; তার মধ্যে একটিকে নামকরণ করলেন প্রিয় দেশের নামে পোল্যান্ড থেকে পোলেনিয়াম। কিন্তু আরেকটি কি সেটা তিনি কিছুতেই বুঝতে পারলেন না এর জন্য আরও পরীক্ষা করতে হবে এবং আরো বেশি ইউরোনিয়াম চেলা চাই কিন্তু এত টাকা পাবেন কোথায় ?

কিন্তু সারা জীবনে কখনোই তিনি সহজে হার মেনে নেননি। শেষে খবর পেলেন বোহেমিয়ার এক খনিতে পাওয়া যাবে এই অমূল্য সম্পদ। তার স্বামী পিয়েরে এর অনুরোধে এক ট্রাক ভর্তি পিচ ব্লেন্ড কুড়ি দম্পতি কে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন খনির মালিক। কিন্তু এতটা পদার্থ রাখবেন কোথায়? বড় কড়াইতে রেখে উচ্চতাপে জ্বাল দিতে হবে ওই পদার্থ। তার জন্য আলাদা ল্যাবরেটরি দরকার। এবারও সমাধান করে ফেললেন মেরি। পিয়ের যেখানে কাজ করেন, সেখানে শারীর বিদ্যা বিভাগের ছাত্ররা একটা ঘরে মরা কাটত; বর্তমানে সেই ঘরটি ফাঁকা ছিল। তারই মেঝেতে স্তূপীকৃত করে রাখা হল পিচব্লেন্ড আর বারান্দায় উনুন করে শুরু হলো গবেষণার কাজ। দিন নাই রাত নাই সারাক্ষণ একটা ভারী লোহার রড দিয়ে পিচব্লেন্ড নেড়ে যেতেন। এই করে কেটে গেল চার চারটি বছর। হঠাৎ বৃষ্টি এলেই দৌড়ে ঢুকে পড়তে তো ঘরে হুড়মুড় করে সমস্ত জিনিসপত্র ঘরে তুলতে হতো। ভিজে গেলে সর্বনাশ! ক্লান্তিতে ভেঙে পড়া সারা শরীর বেয়ে ঘাম ঝরানো, এই করতে করতে দুই বিজ্ঞানী কতগুলো বছর কাটিয়ে দিলেন।

একদিন সংসারের কাজকর্ম সেরে স্বামীকে বললেন চলো একবার ল্যাবরেটরি ঘুরে আসি। দরজা খুলেই দেখলেন সারাঘর আলোয় আলোয় ভর্তি আর পিচব্লেন্ড এর মাঝে পড়ে আছে এক অমূল্য সম্পদ সাত রাজার ধন মানিক। মেরি ও পিয়ের নাম দিলেন রেডিয়াম। এল নোবেল পুরস্কার সহস্র দুঃখের সাধনায় সিদ্ধিলাভ। এতদিন যা দুঃখ কষ্ট করেছেন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অভিনন্দন আর প্রশংসার বন্যায় তা এক নিমেষে মিটে গেল। এখানে কিন্তু তার যাত্রা শেষ নয়। পুরোমাত্রায় তেজস্ক্রিয় পদার্থ নিয়ে কাজ করার ফলে তার শরীরে বাসা বাঁধলো এক দুরারোগ্য অসুখ। সেই রেডিয়াম আবিষ্কারের বছর থেকেই রোগ যন্ত্রণার কবলে পড়লেন মেরি। তবু তিনি হার মানেননি, অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন কাজে নতুন উদ্যমে।

নোবেল পদক ছাড়াও মেরি পেয়েছিলেন প্রাইজ মানি যার মূল্য পঞ্চাশ হাজার। এত অর্থ নিয়ে তিনি কী করবেন! তাই পুরস্কার লব্ধ সমস্ত অর্থ দিয়ে চাইলেন মেরি দেশে ক্যান্সার চিকিৎসার ও গবেষণা কেন্দ্র গড়ে তুলতে। তার জন্য চাই আরো রেডিয়াম যার এক গ্রামের দাম ছিল তখনকার দিনে ৩,১২,৫০০ ডলার।

মেরীর নিঃশ্বাস ফেলার সময় নেই এমন সময় ঘটে গেল বিনা মেঘে বজ্রপাত - তার স্বামী ঘোড়ার গাড়ী চাপা পড়ে মারা গেলেন। দীর্ঘদিনের সহযোদ্ধা চিরদিনের সাথী প্রিয়তম মানুষটিকে হারিয়ে শোকে নির্বাক হয়ে গেলেন মেরী। কিন্তু একটা হার না মানার নারীর গল্প এটা। দুই মেয়ের দেখভাল করা, সংসারের কাজ, স্বপ্নের ল্যাবরেটরি গবেষণার কাজ, রুগ্ন বৃদ্ধ শ্বশুরের সেবা করা — এর পাশাপাশি বই লেখা শুরু করলেন। রেডিয়াম নিয়ে তার গবেষণার কাজ ও নিজের জীবনের নানা অভিজ্ঞতা নিয়ে একের পর এক বই লিখতে শুরু করেন। ১৯১১ সালে তিনি রসায়নে নোবেল পুরস্কার পেলেন।

১৯১৪ সালে শুরু হয়েছিল বিশ্বযুদ্ধ। চারদিকে মৃত্যু, হাহাকার। মেরি হয়ে উঠলেন মমতাময়ী। যুদ্ধে আহত অসংখ্য আর্ত মানুষদের অসহায় কান্নায় পথে পথে এসে দাড়ালেন। তিনি নিজেই অনেকগুলো এক্সরে মেশিন তৈরি করে ফেললেন এবং প্যারিস হাসপাতালে সেগুলো বিনামূল্যে দান করলেন। নিজেই তৈরি করলেন এক ভ্রাম্যমাণ গাড়ি যার নাম দিলেন রেডিওলজিক্যাল গাড়ি এবং একটা এক্সরে মেশিন ডায়নামো চলত গাড়ির মোটরের সাহায্যে আর তৈরি হতো বিদ্যুৎ গাড়ির কাজ ছিল হাসপাতাল ঘুরে ঘুরে রোগীদের চিকিৎসা সাহায্য করা। তার প্রচেষ্টায় তৈরি হলো পোল্যাণ্ডে রেডিয়াম ইনস্টিটিউট ও ক্যান্সার রিসার্চ কেন্দ্র।

দীর্ঘ রোগ-যন্ত্রণা তাকে একদিনের জন্য কাছ হারাতে পারেনি। ক্লান্তি কিংবা হতাশা কোনদিন তাকে গ্রাস করতে পারেনি। দীর্ঘদিন রেডিয়াম নিয়ে কাজ করার পর যা দুরারোগ্য ব্যাধি ঘটেছিল, সেটি তার মৃত্যুর কারণ হলো। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি বলে গেছেন একটু ভালো হয়ে ওঠে আবার কাজ শুরু করবেন, কাত কাজ পড়ে আছে।

দারিদ্রতা, সুখ-দুঃখ, কষ্ট থেকে হার মানাতে পারেনি। তাই মৃত্যু তাকে হার মানাতে পারল না।

(যদি এই গল্পটি পড়ে একটি আশাহত প্রাণ নতুন করে জ্বলে ওঠে তাহলে লেখাটা স্বার্থক।)

কৃপণ ও দানবীর

ড. শান্তা মুখোপাধ্যায়
ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষা, টাকি গভর্নমেন্ট কলেজ

শিরোনামটি অদ্ভুত শোনাচ্ছে না? সোনার পাথরবাটির মত? যদি বিশ্বাস করতে হয় তবে নিচের গল্পটা পুরোটা পড়তে হবে।

"চারদশক আগেকার কথা। ইংরাজী ১৯১৯ সাল। কলকাতা মহানগরীর বুকে আপার সার্কুলার রোডের এক বিশাল অট্টালিকা। তারই ছোট্ট কামরায় বাস করেন শীর্ণকায় এক বৃদ্ধ। মাথায় চুলগুলো ছোট ছোট করে ছাঁটা। মুখমণ্ডল কাঁচা পাকা দাড়ি গোঁফে ভর্তি। সাদাসিধে বেশভূষা। বাহ্যিক আড়ম্বর বা জাঁকজমক তাঁর জীবনে কখনও স্থান পায় নি। ঘরের আসবাবপত্র আরও সাধারণ। একখানা ছোট চৌকি মানে দড়ির খাটিয়া। আর দুটো ছোট কাঠের আলমারী তাও আজেবাজে কেরোসিন কাঠের তৈরি। বৃদ্ধের জীবন-ইতিহাসে বিশ্রাম বা বাবুগিরি বলে কোন কথা লেখা ছিল না। কাঠের আলমারি দুটোতে থাকত সারা সপ্তাহের খোরাক। চিঁড়ে, মুড়ি, গুড়, নারকোলের সন্দেশ অথবা ঘরে তৈরি কোনও, আটপৌরে খাবার।

সপ্তাহের শেষের দিকে শনি-রবিবারের মধ্যে ডাকবিভাগ ও লোক মারফত বর্মা থেকে শুরু করে পাঠান অঞ্চল, নানা জায়গা থেকে খাবার এসে যেত। যেমন নানা প্রকারের খাবারে ভরে উঠত ছোট্ট দুটো আলমারী, তেমনি বৃদ্ধের মনও খুশীতে ভরে উঠত।"

কে এই বৃদ্ধ? মহম্মদ শহীদুল্লাহের লেখা থেকে চিনতে পারলেন? পারলেন না? আচ্ছা, আরেকটু সূত্র দিচ্ছি। বৃদ্ধের ঐ দুই আলমারী খাবার প্রায় প্রতি রবিবারেই স্যার আশুতোষ এসে নাকি একাই খেয়ে ফেলতেন!

একটু চেনা চেনা মনে হচ্ছে?

তাহলে চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যের লেখা থেকে বলি।

"একদিন দুপুরবেলা আচার্যদেবের কাছে গেলুম। সেদিন ছিল রবিবার, সুতরাং পরীক্ষাগারে থাকতেন না, তাঁর ঘরেই তাঁকে পেলুম। কাজ সেরে চলে আসছি, ঐ ঘরের মধ্যেই ছোট্ট একটু ঘেরা জায়গায় কুকারে তাঁর রান্না চড়েছিল। সামনে বেয়ারা ছিল, তাকে জিজ্ঞেস করলুম — আজ কি রান্না হচ্ছে? বললো — ভাত, মুসুরির ডাল, আলুসেদ্ধ। আমাদের কথাবার্তা বোধহয় আচার্যদেবের কানে পৌঁছেছিল! তিনি এগিয়ে এসে বললেন, মাখন দিয়ে আলুসেদ্ধ খেয়েছ? চমৎকার! একেবারে অমৃত! আমি মাঝে মাঝে খাই বলে ফিরে গেলেন। 'মাঝে মাঝে খাই।' রোজ খাবার পয়সা কোথায়? সাতশ টাকা মাসে মাইনে তার সবই তো যায় ছাত্রদের দিতে। বেঙ্গল কেমিক্যালের ডিরেক্টর হিসাবে যা পান তা তো সেখানকার কর্মীদের ক্লাবে দিয়ে আসেন, তারা আমোদ আহ্লাদ করবে। আর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরীক্ষক হিসাবে যা আসে তা যায় অন্য প্রতিষ্ঠানে।"

তাহলে আয় ব্যায়ের নমুনা পেশ করি?

আয়ের হিসাবঃ

প্রেসিডেন্সি কলেজ	Rs. 500x12 মাস x27 বছর	=	1,62,000/-
পেনশন	Rs. 430x12 মাস x28 বছর	=	1,44,480/-
সায়েন্স কলেজ	Rs. 1000x12 মাস x20 বছর	=	2,40,000/-
মোট			Rs. 5,46,490/-

১৯০০ সালে যখন তাঁর বয়স ৩৯ বছর, তিনি অর্জিত সমস্ত সম্পত্তি ও ভবিষ্যতের সম্ভাব্য অর্জেয় সম্পত্তি ট্রাস্টির হাতে দান করেন, তার মধ্যে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষক হবার পারিশ্রমিকও ছিল। তাঁর দান পেয়েছেন কোন কোন প্রতিষ্ঠান ?

১। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

২। ইন্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটি

৩। বাগেরহাট পি সি কলেজ

৪। চিত্তরঞ্জন হাসপাতাল

৫। কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ

৬। নারী কল্যাণ আশ্রম

৭। ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশন

৮। খাদি প্রতিষ্ঠান

৯। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ

১০। ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়

১১। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ

১২। দৌলতপুর হিন্দু একাডেমি

১৩। নলহাটি এইচ ই স্কুল, খুলনা

১৪। বীরধাতা এইচ ই স্কুল, খুলনা

১৫। সাইহাটি পি সি ইন্সটিট্যুট

১৬। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ....

এইভাবে মোট ৪৫টি সংস্থাকে দান করেন, যার মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি, ক্যালকাটা ডেফ অ্যান্ড ডাম্ব স্কুল, ইন্ডিয়ান ইন্সটিট্যুট অফ মেডিক্যাল রিসার্চ, ক্যালকাটা নার্সেস ইন্সটিট্যুট, যাদবপুর টিবি হাসপাতাল উল্লেখযোগ্য।

এগুলো সবই সংস্থাকে দান। ব্যক্তিগত স্তরে অসংখ্য ছাত্রছাত্রীকে দান অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনুচ্চারিত থেকে গেছে। দানের জন্য ব্যক্তিগত জীবনে কৃচ্ছসাধন তাঁর জীবন-শৈলী ছিল। নিজের সম্পর্কে অপার ব্যয়কুণ্ঠা আর অপরের জন্য অকাতরে দানের আরেকটি উদাহরণ দিয়ে শেষ করব।

কলেজের অনেক গরীব ছাত্র তাঁর ঘরের পাশে দুটি ছোট কামরায় থাকত এবং কম খরচে পড়াশোনা করত। মেঘনাদ সাহা, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, জ্ঞান ঘোষ, সবাই এভাবেই পড়াশোনা করেছেন। একজন ছাত্র ছিলেন নদীয়াবিহারী। তাঁর উপর ছিল গৃহস্থালী ও জমাখরচের হিসাবের ভার। নিয়ম ছিল তাঁর জন্য রোজ দুপয়সার চাঁপা কলা আসবে। একদিন নদীয়াবিহারী বাজার থেকে বেশ সুপুষ্ট দুটি মর্তমান কলা এনেছেন। বৃদ্ধ খুব খুশী। জিজ্ঞেস করলেন, কতদাম ? নদীয়াবিহারী বললেন, ''দু আনা।'' ব্যাস ! অমনি বুড়ো নদীয়াবিহারীকে চুল ধরে ঘুঁষি মেরে বললেন, 'নবাবী শিখতে আরম্ভ করেছ ?' এ ঘটনা সকাল নটার। এগারোটা নাগাদ প্রফুল্লচন্দ্র

ঘোষ এসে বললেন অভয় আশ্রমের খদ্দর প্রচার ও জনহিতকর কাজে কিছু টাকার দরকার। বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করলেন, 'কত?' ঘোষমশাই বললেন, 'হাজার তিনেক হলেই হবে।' আবার ডাক পড়ল নদীয়াবিহারীর। 'ব্যাঙ্কের পাশবইতে কত টাকা আছে?' জিজ্ঞাসা বৃদ্ধের। নদীয়াবিহারী বললেন, 'সাড়ে তিনহাজার।' বৃদ্ধ হুকুম দিলেন চেক বই নিয়ে আসার। চেকবই এলে তিনহাজার টাকার চেক কেটে শ্রী ঘোষের হাতে দিলেন। এবার চেনা গেল বৃদ্ধকে?

গান্ধীজী এই বৃদ্ধের সম্পর্কে বলেছিলেন, "It was difficult to believe that the man in simple Indian dress and wearing simpler manners could possibly be the great Scientist and Professor he even then was. And it took my breath away when I heard that out of his princely salary he kept only a few rupees for himself and the rest he devoted to public uses and particularly for helping poor students."

তিনি আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়। বাঙালী মনীষীর উজ্জ্বল নক্ষত্রদের মধ্যে স্বমহিমায় ভাস্বর।

বাদাম

অনুলেখা দাস
বিজ্ঞান স্নাতক, ২০২১

শত্রুতা প্রতিবেশীদের মধ্যে কমবেশি থেকেই থাকে। তা বলে বাড়ির বাচ্চা থেকে বুড়ো, বউ বনাম বউ দিন রাত লেগেই আছে! বরং পাড়ার বাকিরা বুঝতেই পারে না, এদের ঝগড়া বাধানো ছাড়া বাকি কোনো কাজ আদৌ আছে কিনা। এই তো সেদিন মিত্তির বাড়ির বড় কত্তা বিকালে পার্কে পায়চারি করছিলেন আর গিন্নীর নিজের হাতে ভাজা বাদাম চিবাচ্ছিলেন। কথায় বলে শত্রুকে ঘায়েল করতে গেলে তার দুর্বলতা সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিবহাল থাকা প্রয়োজন। সেরকম ভাবেই ওনার চোখে কম দেখার সুযোগে পার্কের বেঞ্চে বসে থাকা ব্যানার্জি বাবু দিলেন নিজের ঠ্যাংটা বাড়িয়ে। আর - কি! আচ্ছা এই ষাটোর্ধ্ব দুই ব্যক্তির এহেন কান্ড মানুষের মনোরঞ্জক হবে নাকি মাথাব্যথার কারণ হবে তা বিচার করতে নির্ঘাত সুপ্রিম কোর্ট ও বেগ পাবে। সেদিন তো যা-তা কান্ড, ওই বয়সে কোমরে লেগে গেলে কি হতে পারে বুঝতেই পারছেন। প্রায় অন্ধকার হয়ে এসেছিল বলে পাথরের ওপর দোহাই দিয়ে এক মহাসংঘাত আটকানো সম্ভব হয়েছিল। যদিও মিত্তিরদের এই ঘটনার কারণ বুঝতে বিশেষ অসুবিধা হয়নি।

ইস্কুলে দু-বাড়ির বাচ্চাদের মধ্যে ধাক্কা মেরে টিফিন ফেলে দেওয়া, মিথ্যে বলে শাস্তি খাওয়ানো - এসব এখন হেডমাস্টারও বুঝে গেছেন। আগের মাসে ব্যানার্জি বাড়ির ছোট নাতি টিফিনে যখন ফুচকা খাচ্ছিল, ফুচকাওয়ালাকে পঞ্চাশ টাকার লোভ দেখিয়ে, পচা মিত্তির, মানে উনি হলেন মিত্তির বাড়ির আদরের বড় নাতি, একেবারে একখান ডাকাতে ছেলে করলে কিনা দশটা লঙ্কা মাখিয়ে চুপিচুপি খাইয়ে দিলে। বাচ্চা ছেলেটা সেকি কান্না! যাকগে সে কথা বাদ দিন। সেদিন স্কুলে হেডমাস্টারের ঘরের সামনে টেবিল চাপড়ানো থেকে বাঁশ ভেঙ্গে এনে তেড়ে যাওয়া, এমনকি মাঝে পড়ে হেডমাস্টারের চশমা টাও ভাঙ্গলো। তারপর ঝগড়া মিটলে মিত্তির বাড়ির মেজো ছেলে দু-বাড়ি থেকে ওখানেই চাঁদা তুলে চশমার দামটা পকেটে গুঁজে দিয়ে সবাই একসাথেই বাড়ি ফিরলেন। আমি ছাপোষা ব্যাংক কর্মচারী, হাতিপাড়া উন্নয়ন সমিতির পাশে বাড়ি। আমাদের বাড়ির উল্টোদিকে পাশাপাশি বাড়ি দুটি হল মিত্তির আর ব্যানার্জি দের। রবিবার দিনটা আমার প্রিয়, ছুটি বলে নয় কিন্তু। ওইদিনটাতো মজা চাক্ষুষ করার দিন। মিত্তিরদের বাড়ির কত্তা হলো ভবেশ মিত্র। তিন ছেলে নরেশ, দেবেশ ও দেবদাস। দেবেশবাবুই দু-বাড়ির মধ্যে এই একটুখানি বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন বলে আমার মত। ভবেশবাবু ও তার গিন্নী, তিন ছেলে বৌমা, নাতি ও দুই নাতনি নিয়ে সংসার জমজমাট।

পাশের ব্যানার্জিদের বাড়ির কত্তা ভবেশ বাবুর ক্লাসমেট নরেন ব্যানার্জি। ক্লাসে ফার্স্ট - সেকেন্ড হওয়া থেকেই তাদের ঝামেলার সূত্রপাত, যা সংক্রামিত হয়েছে তাদের স্ত্রী, পুত্র কন্যাদের মধ্যেও। নরেন ব্যানার্জির দুই ছেলে এক মেয়ে, জামাই ডাক্তার মানুষ, তাঁর একটা মান সম্মান আছে, এই কাদা ছোড়া ছুড়ির মধ্যে তিনি তাঁর স্ত্রীকে কিছুতেই ঢুকতে দেবেন না সেটাই স্বাভাবিক। দুই ছেলে সৌম্যনাথ আর রম্যনাথ। রম্যনাথ এখনো বিয়ে করেননি, নতুন সৈনিকের খোঁজে আছেন তিনি। বড়ছেলের এক মেয়ে ও এক ছেলে। সংখ্যায় কম হলে কি হবে, নরেন ব্যানার্জি একাই একশ। তাঁর পরিকল্পনায় নানারকম অভিযান চলতেই থাকে।

জানেন, আমার রোববার গুলো ভালো কাটে না, সে শুধু রোববার কেন, সপ্তাহের কোনদিনই আর কিছু হয় না, ওই যে সেদিন স্কুলে ঝামেলা হল, সেদিনই দেবেশ বাবুর তত্ত্বাবধানে দু বাড়ির মধ্যে একটা ছোটখাটো বৈঠক হল এবং স্বাক্ষরিত হল শান্তিচুক্তি।

সমিতির সেক্রেটারি হলেন মিডল ম্যান। ঠিক হল উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কেউ আর কাউকে চটাতে যাবে না। কোন কিছু হলে ভুক্তভোগী পরিবার সমিতিকে জানাবে ও থানায় লিখিত অভিযোগ করবে। চুক্তিপত্র থানাতেও একটা জমা দেওয়া হল। দেখুন পুলিশের নামে অনেক কিছুই ঠান্ডা হয়, এটাও হল। মাস কেটে গেল, আমার মজাটাও মরে যেতে লাগল। ভবেশবাবু কেবল জানলার ধারে বসে বাদামই খান। বাড়ির বৌরা রান্নাবান্না করে, ছেলে মেয়েদের ইস্কুল-পাঠশালা, খেলাধূলা সব কিছুতেই চাপা উত্তেজনা থাকলেও আপাত শান্তি বজায় রাখে। নরেনবাবু উঠোনে পায়চারি করেন আর উঁকি মেরে মেরে দেখেন পাঁচিলের পাশ দিয়ে।

নিরবতা ভাঙল, হ্যাঁ, আর ভাঙল মিত্তির বাড়িই। সে এক রবিবার, আমার প্রিয় রবিবার। সকাল দশটা নাগাদ সমিতির লোক আর পুলিশ নিয়ে ব্যানার্জি বাহিনী হাজির হল মিত্তির বাড়ির সামনে। এক অনাবিল আনন্দ জেগে উঠল আমার মনে। হাতে চা নিয়ে এক দুর্দান্ত সম্ভাবনার কথা আন্দাজ করে বসে পড়লাম ব্যালকনিতে। পুলিশের অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে মনে হল কেটে পড়াই ভালো। কারণ পারিবারিক ঝামেলা মেটাতে এসে শেষে প্রাণ টাই না বেঘোরে চলে যায়। সামনে চলছে মারামারি, কিল-ঘুষি, চুলোচুলি। ব্যাট উইকেট, হাতা-খুনতি, টেবিল-চেয়ার সহ সুসজ্জিত বাহিনীদ্বয়ের এক ধুন্দুমার রোমহর্ষক লড়াই চাক্ষুষ করার লোভ কার না থাকে। তা এই মহাযুদ্ধের কারণ যেটা জানা গেল, তার মূলে বাদাম। খানিকটা এরকম- ব্যানার্জি বাড়ির বউ যখন তাদের বাড়ির সীমানায় রাস্তার পাশ থেকে শুশনি শাক তুলেছিলেন, ঠিক সেই সময় নাকি ভবেশ ছুঁড়ে মারলেন বাদাম। এক বুড়ো কিনা পাশের বাড়ির বৌমার গায়ে বাদাম ছুঁড়েছেন ! ছিঃ ! সব সীমা ছাড়িয়ে গেল এই পাপ। আহতের হিসেব করে লাভ নেই। দুই বুড়োকেই হাসপাতালে পাশাপাশি বেডে ভর্তি করা হল। বাল্য বন্ধু একসাথেই খাটে উঠবেন কিনা সে তো সময়ই বলবে। কিন্তু এই ঘটনার তদন্তভার পুলিশ কে নিতেই হল এবং ভবেশবাবু যে এ কাজ করেন নি তার পক্ষে প্রমাণ দেখলেও, তার জানলার ধারে বসে বাদাম খাওয়ার অভ্যেস সবকিছুই পরিষ্কার করে দিতে লাগল।

বাবাঃ ! ! কি ঝামেলা, উত্তেজনার চোটে দুই বুড়ো মরতে বসেছে। ঘাট হয়েছে, আর দরকার নেই আমার মজার। যাওয়ার আগে চুপিচুপি একটা কথা বলে যাই — আজ্ঞে বুঝতেই পারছেন, দীর্ঘদিন নিরস রোববার কাটাতে কি আর ভালোলাগে ? শুনুন কাউকে বলবেন না, ওই দিন সকালে বাজার করে ফেরার সময়, কোনরকম অভ্যেস না থাকা সত্ত্বেও পঞ্চাশ গ্রাম খোলা ছাড়ানো বাদাম আমিই কিনে এনেছিলাম।

ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নিযুক্ত ভারতবর্ষে উদ্ভিদবিদ্যা গবেষণার অগ্রপথিক উইলিয়াম রক্সবার্গ

শুভ্রদীপ দে,
অধ্যাপক, উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ

ভারতবর্ষে আধুনিক উদ্ভিদবিদ্যা গবেষণার ও উদ্ভিদচর্চার পথিকৃৎ স্বনামধন্য উইলিয়াম রক্সবার্গ বর্তমান গ্রেট ব্রিটেনের স্কটল্যান্ড প্রদেশের এরিশায়ারের ক্রেগির প্যারিসের আন্ডারউড নামক স্থানে ১৭৫১ সালের ৩রা জুন জন্মগ্রহণ করেন। মেধাবী ছাত্র রক্সবার্গ স্কুলের শিক্ষা শেষ করে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। তখন এই বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন ডঃ জন হোপ (১৭২৫-১৮৮৬)। রক্সবার্গ ছিলেন অধ্যাপক হোপের প্রিয় ছাত্র। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হোপের তত্ত্বাবধানে তিনি উদ্ভিদবিদ্যা অধ্যয়ন করেন। এডিনবরায় ছাত্র থাকাকালীন অধ্যাপক জন হোপের ব্যক্তিগত প্রভাবের ফলে রক্সবার্গ উদ্ভিদবিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

কিশোর বয়স থেকে রক্সবার্গের মনের ইচ্ছা ছিল সার্জেন হওয়া বা সার্জেনের সঙ্গী হিসেবে কাজ করা। যখন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তখন তিনি চিকিৎসাবিদ্যার ক্লাসেও উপস্থিত থাকতেন। রক্সবার্গের আরেকটি আকাঙ্খা ছিল সমুদ্রযাত্রার। অধ্যাপক হোপের সুপারিশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিতে তিনি একটি চাকুরি পান এবং সেই সুবাদে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জাহাজে তিনি কয়েকবার ভারতের দিকে সমুদ্র যাত্রা করেন।

১৭৭৬ সালে রক্সবার্গ ২১ বছর বয়সে ভারতের মাদ্রাজ (বর্তমান চেন্নাই) শহরে এসে পৌঁছন ও কোম্পানির সৈন্যদলের সার্জন হিসাবে কাজে যোগদান করেন। এখানে এসে তিনি ১৭৭৭ সালে আবহবিদ্যা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহে নিযুক্ত হন। ১৭৮১ পর্যন্ত তিনি এখানেই ছিলেন।

কাল ভন্ লিনের প্রিয় ছাত্র ছিলেন যোহান জেরহার্ড কোয়েনিগ (মিশনারী বা ধর্মপ্রচারক সার্জেন, ১৭২৮-১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ)-এর সঙ্গে রক্সবার্গ পরিচিত হন। কোয়েনিগ ছিলেন ভারতের রক্সবার্গের অন্যতম বিজ্ঞানী বন্ধু। রক্সবার্গের সমসাময়িক অনেক উদ্ভিদবিজ্ঞানী ছিলেন; কিন্তু অধিকাংশ বিজ্ঞানী কেবলমাত্র নাম ও বর্ণনাহীন উদ্ভিদের শুষ্ক নমুনাই ইউরোপের বিভিন্ন উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীর নিকট পাঠাতেন।

উইলিয়াম রক্সবার্গ যখন মাদ্রাজের সামালকোট্টায় উদ্ভিদ নিয়ে গবেষণায় রত সেই সময়ে কলকাতা-হাওড়ায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর পোতাশ্রয় বা বন্দরের সুপারিনটেনডেন্ট্ এবং ফোর্ট উইলিয়ামের সামরিক পর্ষদের সচিব কর্ণেল রবার্ট কিড্ (১৭৪৬-১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দ) হাওড়ায় একটি উদ্ভিদ-উদ্যান প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। উদ্ভিদবিদ্ না হয়েও একটি উদ্ভিদ-উদ্যান প্রতিষ্ঠায় তাঁর ছিল প্রচণ্ড আগ্রহ ও উৎসাহ। হাওড়ার শালিমারে তিনি একটি ব্যক্তিগত বাগান গড়ে তোলেন। মসলা প্রদায়ী গাছ, বিভিন্ন উপকারী উদ্ভিদ ও জাহাজ তৈরির পক্ষে উপযুক্ত ব্রহ্মদেশীয় সেগুন গাছ লাগান বা বসানোর জন্য তিনি হুগলী নদীর পশ্চিম তীরে ৩১০ একর জমি নির্দিষ্ট করেন। এখানে একটি উদ্ভিদ-উদ্যান প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব তিনি কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করেন (১৭৮৬ সালের ১লা জানুয়ারি) তাঁর প্রস্তাবটি বিবেচিত হয় ১৭৮৭ সালে।

রবার্ট কিড্কেই বলা হয় উল্লিখিত উদ্ভিদ-উদ্যানের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি এই উদ্যানের প্রথম (অবৈতনিক) সুপারিনটেন্ড রূপে নিযুক্ত হন। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তিনি এই পদে আসীন ছিলেন (১৭৮৭-১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দ)। কিডের গড়া বাগানটি ‘কলকাতার বাগান’ বা ‘কোম্পানীর বাগান’ নামে পরিচিতি লাভ করে।

১৭৯৩ সালের গ্রীষ্মকালে কিড্ অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং এই বছরের ১৮ই মে তাঁর মৃত্যু হয়। কলকাতার পার্ক স্ট্রীটের সমাধি স্থলে তাঁকে সমাহিত করা হয়। তাঁর স্মৃতি রক্ষার জন্য বাগানে ১৭৯৫ সালে একটি মর্মরমূর্তি স্থাপিত হয়। মূর্তিটি আজও বর্তমান। কর্ণেল কিডের মৃত্যুর পর (২৬শে মে, ১৭৯৩ খ্রি.) প্রথম বেতনভুক্ত সুপারিনটেন্ডেন্ট রূপে নিযুক্ত হয়েছিলেন উইলিয়াম রক্স্‌বার্গ। তিনি ছিলেন কোম্পানী (The English East India Company) -র মাদ্রাজস্থিত শাখার উদ্ভিদবিজ্ঞানী।

উইলিয়াম রক্স্‌বার্গ প্রথমাবধি উদ্ভিদ উদ্যানেই বসবাস করার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। তাঁর আমলেই ভাগীরথী-হুগলী নদীতীরস্থ বহু পুরাতন, ইতিহাসের সাক্ষী, থানা মাকুয়া দুর্গের পরিত্যক্ত ধ্বংসাবশেষের উপর 'সুপারিন্টেন্ডেন্টস রেসিডেন্ট' গড়ে ওঠে। উইলিয়াম রক্স্‌বার্গ-এর মাসিক বেতন ছিল পনেরোশ টাকা এবং অফিস খরচ হিসাবে মাসিক পাঁচশ টাকা ধার্য হয়েছিল।

রক্স্‌বার্গ এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ডক্টর অফ্ মেডিসিন' উপাধি লাভ করেছিলেন। ১৭৭৬ সনে তিনি আর্কটের নবাবের পদস্থ কর্মী কোয়েনিগ-এর সাথে পরিচিত হন। কোয়েনিগ ছিলেন বিখ্যাদ উদ্ভিদবিজ্ঞানী কার্ল ভন্ লিনের একনিষ্ঠ, গুণমুগ্ধ ছাত্র।

ভারতবর্ষে কার্ল ভন্ লিনের 'অবতার' রূপে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন ক্যাম্পবেল, কেরী, ফ্লেমিং, হার্ডউইক, বুকানন হ্যামিল্টন, ক্লেইন, রটলার, সোনেরাট প্রমুখ উদ্ভিদবিজ্ঞানীরা।

রক্স্‌বার্গ বাগানের তিনশ একর জমিতে নানান ধরনের লতা-গুল্ম-বৃক্ষাদি রোপণ করে নিয়মিত পরিচর্যা করতেন। তাঁর একাধিক গবেষণা-গ্রন্থ কালজয়ী। তাদের মধ্যে আবার সবিশেষ উল্লেখযোগ্য 'ফ্লোরা ইন্ডিকা', পঁয়ত্রিশ খন্ডে বিবৃত, গাছপালা, লতা-গুল্ম প্রভৃতির রঙিন চিত্রাবলীর দ্বারা সমৃদ্ধ।

বরাবর রুগ্ন রক্সবার্গ ১৮১৩ সনে উত্তমাশা অন্তরীপ থেকে সমুদ্রযাত্রা করে অ্যাটলান্টিক মহাসাগরের সেন্ট হেলেনা দ্বীপে কিছুদিন অবস্থান করে অবশেষে জাহাজে চেপে ইংল্যান্ডে ফিরে যান এবং সেখানেই ১৮১৫ সনের ১৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখে তাঁর দেহাবসান ঘটে। সেন্ট হেলেনাতে থাকার সময় তিনি ভারতের তন্তুজ উদ্ভিদ সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লেখেন ও এক বন্ধুর কাছে পাঠান। এই বন্ধুর সম্পাদনায় ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অর্থানুকূল্যে ১৮১৫ সালে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়।

কলকাতার উদ্ভিদ-উদ্যানে সাদা বা নর্চা বা নলতে পাট ও তোষা বা মিঠা পাট সম্পর্কে তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন। উল্লিখিত প্রবন্ধে ভারতে পাটের চাষ, ব্যবহার ও উপকারিতা বিষয়ে উল্লেখ আছে। স্মরণ করিয়ে দেওয়ার মতো বিষয়, তাঁর পরীক্ষা নিরীক্ষার পূর্বে ভারতে স্থানীয়ভাবে পাটের চাষ হতো। রক্স্‌বার্গ পরীক্ষামূলক ভাবে কলকাতার উদ্ভিদ-উদ্যানে পাটের চাষ করেন এবং একশ টন পাট তন্তু (কাঁচা পাট) লণ্ডনে পাঠান। বলা যেতে পারে যে, ভারতে পাট শিল্পের উন্নতি বিধানে রক্সবার্গই হলেন পথিকৃৎ। পাট ও অন্যান্য তন্তুজ উদ্ভিদের উপর গবেষণার ফলে উৎপন্ন তন্তু নমুনা 'ইন্ডিয়া হাউস' ও 'রয়েল সোসাইটি অফ আর্টস, লণ্ডন'-এ তিনি প্রেরণ করেন। এই গবেষণার জন্য উক্ত সোসাইটি তাঁকে তিনটি স্বর্ণাপদক প্রদান ক'রে সম্মানিত করে। তন্তুজাতীয় উদ্ভিদ সম্পর্কে তাঁর গবেষণার ফল ১৮০৪ সালে সোসাইটির ট্রানজাক্সনে প্রকাশিত হয়।

লণ্ডনের বিখ্যাত কিউ গার্ডেনের সাথে গাছপালা বিনিময় করে ভারতবর্ষের দক্ষিণ উপকূল অঞ্চল থেকে নানাবিধ বৃক্ষ-লতা-গুল্ম সংগ্রহ করে আলোচ্য উদ্যানটিকে সমৃদ্ধ করেছিলেন রক্স্‌বার্গ। বৃক্ষ-লতা-গুল্মের প্রতি এমন আকর্ষণ ও ভালবাসা খুব কম মানুষের মধ্যেই দেখতে পাওয়া গিয়েছে।

রক্স্‌বার্গ সেন্ট হেলেনা দ্বীপে ছিলেন ১৮১৩ থেকে ১৮১৪ সাল পর্যন্ত। এই দ্বীপে জন্মায় এমন সব উদ্ভিদের একটি বর্ণনামূলক তালিকা তিনি প্রস্তুত করেছিলেন। এই রচনাটি ১৮১৬ সালে প্রকাশিত হয়। শেষবারের মতো ভারতবর্ষ ত্যাগ করার পূর্বে রক্স্‌বার্গ উইলিয়াম কেরীর হাতে নিজের 'ফ্লোরা ইন্ডিকা'র সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি রেখে গিয়েছিলেন। গ্রন্থাকারে প্রকাশনার কাজে সহায়তা করেছিলেন নাথানিয়েল ওয়ালিচ্। রক্স্‌বার্গের দুই পুত্র জেমস এবং ব্রুস্-এর উদ্যোগে, কেরীর সম্পাদনায় তিনটি সংখ্যায় (১৮৩২) 'ফ্লোরা ইন্ডিকা' প্রকাশিথ হয়। এতে রক্স্‌বার্গ কর্তৃক অন্তর্ভুক্ত ফার্ণগুলি কোনো এক অব্যাখ্যাত কারণে বাদ দেয়া হয়েছিল। পরে

অবশ্য গ্রিফিথ-এর সহায়তায় ফার্ণসমূহ সংক্রান্ত অংশটিও মুদ্রিত হয়। এইসব গ্রন্থাদির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই গ্রন্থসমূহ সর্বমোট ২,৩৮২টি রঙিন চিত্র সংযোজিত। ছবি/চিত্রাদি দেশীয় ও প্রকৃতিজাত রঙের সাহায্যে এঁকেছেন বাঙালি শিল্পীরাই। কেন উইলিয়াম রক্সবার্গকে 'দ্য ফাদার অফ ইন্ডিয়ান বোটানি' আখ্যা ওয়া হয় তা নিশ্চয়ই এখন বুঝতে পারা যাচ্ছে।

হাওড়া নগরবাসীরা গর্বিত এই কারণে যে, রক্সবার্গের অন্যতম উল্লেখযোগ্য কর্মক্ষেত্র ছিল হাওড়া (শিবপুর) স্থিত 'বোটানিক গার্ডেন।'

রক্সবার্গের মৃত্যুর পর তাঁর স্মৃতিরক্ষার্থে ১৮১৫ সনে শতাব্দীর অধিক প্রাচীন বটবৃক্ষের অতি নিকটে স্থাপিত হয়েছে স্মারকবেদী। বোটানিক গার্ডেনে কর্ণেল রবার্ট কিডের আবক্ষ মূর্তির মতো উল্লেখিত স্মারকটিও অবশ্য দ্রষ্টব্য। তাঁর ভারত থেকে চলে যাবার আগে তাঁরই অনুরোধে ডঃ ফ্রান্সিস বুকানন হ্যামিল্টন কলকাতা উদ্ভিদ-উদ্যান-এর সবেতন সুপারিনটেন্ডেন্ট পদে নিযুক্ত হন। তাঁর আমলে যে বটবৃক্ষটি ছিল নেহাৎই শিশু তা হয় মহাবটবৃক্ষ। তা হয়ে উঠেছে উদ্ভিদ-উদ্যানটির যথার্থ-প্রতীক।

উইলিয়াম রক্সবার্গ-এর দ্বারাই ভারতবর্ষে বিজ্ঞানের অন্যতম শাখা উদ্ভিদবিজ্ঞানের গোড়াপত্তন হয়। এই বিজ্ঞানের নানান শাখায় অবাধ বিচরণের ক্ষমতা ছিল তাঁর। উপরন্তু আবহাওয়ার অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থায় কোন্ ধরনের প্রভাব বৃক্ষরাজির উপর পড়ে, খরা-বন্যার প্রভাব উদ্ভিদজগৎ ও প্রাণীজগৎ-এর উপর কী ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। যথেচ্ছ বৃক্ষনিধনের সঙ্গে আবহাওয়ার মতিগতির সম্পর্ক, খরা-বন্যার সময় কোন ধরনের উদ্ভিদ কাছ থেকে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর খাদ্যাদি পাওয়া সম্ভব — এমনিতর বিচিত্র বিষয়ে গবেষণা করে গেছেন উইলিয়াম রক্সবার্গ। প্রকৃতি ও আবহাওয়া নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ক'রে তার ফলাফল লিপিবদ্ধ করতেন তিনি। খ্রিস্টীয় ১৮শ শতকের শেষভাগে অথবা ১৯ শতকের প্রথম দশকে কেবলমাত্র নিয়মিত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হতো (বর্তমান কালের আধুনিক যন্ত্রপাতি তখন ছিল না)।

বৃক্ষনিধন ও অরণ্যের ধ্বংস আবহাওয়ার ভারসাম্য নষ্ট ক'রে দিচ্ছে, বৃষ্টি-বাদলকে প্রতিহত ক'রে দুর্ভিক্ষের জন্ম দিচ্ছে, ফলে খাদ্যাভাবে মানুষ মারা যাচ্ছে — এই 'আপাততুচ্ছ' বিষয়টির প্রতিও উইলিয়াম রক্সবার্গ আকৃষ্ট হয়েছিলেন। খ্রি. ১৭৭৬ সন থেকে শুরু ক'রে আমৃত্যু আবহাওয়া, বন্যা, খরা, খাদ্যাভাব, কৃষির ফলনহ্রাস, প্রাকৃতিক বিপর্যয় প্রভৃতির পারস্পরিক প্রভাব ও আন্তঃ সম্পর্ক নিয়ে তিনি গবেষণা করেছিলেন। তাঁর সুপারিশ অনুযায়ী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী মাদ্রাজ এলাকায় খাল, নালা, নদী সহ বিভিন্ন প্রকার জলাশয়ের ধারে ধারে নারকেল গাছ লাগানোর বন্দোবস্ত করেছিলেন। বস্তুতপক্ষে উইলিয়াম রক্সবার্গ কেবলমাত্র ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর স্বার্থবাহী কর্মী ছিলেন না, সমগ্র মানব সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে তিনি আজীবন কাজ করে গেছেন।

খাদ্য সুরক্ষায় উদ্ভিদ বৈচিত্রের ভূমিকা

ডঃ শৌভিক দাশ
অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ

মানুষ ও উদ্ভিদ এই দুইয়ের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড় ও চিরন্তন। সভ্যতার আদিপর্বে গুহাবাসী মানুষ থেকে বর্তমানের আধুনিক মনুষ্যসমাজ, বিবর্তনের ধারা বেয়ে এগিয়ে চলা মানবসভ্যতা, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উদ্ভিদবৈচিত্র্যের ওপর নির্ভরশীল। মানুষ তথা মানবসভ্যতার অস্তিত্বরক্ষায় উদ্ভিদ সবচেয়ে বড়ো বন্ধু। বেঁচে থাকার জন্য তিনটি জিনিষ অত্যাবশ্যক — খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থান। এই তিনটি প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যে উদ্ভিদবৈচিত্র্যকে, মানুষ আবহমান কাল ধরে ব্যবহার করে আসছে। এই ব্যবহার বর্তমানে বহুগুন বেড়ে গেছে। কতগুলি তথ্য সেকথা প্রমাণ করে —

- আগামী ২০৩০ সাল নাগাদ পৃথিবীর জন সংখ্যা বেড়ে হবে প্রায় ৯০০ কোটি, বর্তমানে যে সংখ্যাটা প্রায় ৬০০ কোটির কাছাকাছি।
- বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় ১২০ কোটি মানুষ উপযুক্ত আহার পান না।
- বর্তমানে প্রায় ২০০ কোটি মানুষ যে খাবার গ্রহন করেন তাতে একাধিক জরুরী মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট (Micronutrient) অনুপস্থিত।

এমন পরিস্থিতিতে উদ্ভিদ এক প্রধান অবলম্বন হয় উঠতে পারে। পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে থাকা এই বিশাল উদ্ভিদ জগতের অনেকটাই এখনও অনাবিস্কৃত। এদের চরিত্রায়ণ হয়নি এবং উপযোগিতা সম্পর্কে সম্যক ধারণা এখনও আমাদের নেই। ইংল্যান্ডের কিউ বোটানিক গার্ডেনের এক তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে সমগ্র পৃথিবীতে প্রায় ৩৯১,০০০টি উদ্ভিদ প্রজাতি পরিচিতি পেয়েছে, তার মধ্যে প্রায় ৯৪% সপুষ্পক উদ্ভিদ। একটি হিসাব অনুযায়ী ভারতবর্ষে প্রায় ৪৫,০০০টি উদ্ভিদ প্রজাতি নথিভুক্ত হয়েছে তারমধ্যে গুপ্তবীজি উদ্ভিদের সংখ্যা প্রায় ১৭,৫০০টি। এই বিশাল উদ্ভিদজগতের কেবলমাত্র ৩০টি প্রজাতি প্রায় ৯৫% খাদ্যসরবরাহের গুরুদায়িত্ব বহন করে চলেছে। সুতরাং এক বিরাট সংখ্যক উদ্ভিদের গ্রহনযোগ্যতা ও উপযোগিতা এখনও অনাবিস্কৃত। বর্তমান পৃথিবীতে যেখানে জনবিস্ফোরণ এক জ্বলন্ত সমস্যা এবং খাদ্যসুরক্ষা একটি জরুরী প্রয়োজন, সেখানে এদের মূল্যায়ণ ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ।

জাতিগত উদ্ভিদবিদ্যার (Ethnobotany) মূল্যায়ণ ঃ

মানুষ ও উদ্ভিদের মাঝে বিদ্যমান সম্পর্কের বৈজ্ঞানিক মূল্যায়ণ জাতিগত উদ্ভিদবিদ্যার মূল উপজীব্য বিষয়। মানব সমাজে বিশেষতঃ অনুন্নত আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে বিভিন্ন প্রয়োজনে উদ্ভিদের নানাবিধ ব্যবহার সম্পর্কে আলোকপাত করাই এর উদ্দেশ্য।

পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চলে, বিশেষত আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায়, যেখানে বর্তমান সভ্যতার আলো তেমনভাবে পৌঁছায়নি, সেখানকার মানুষ তাদের জীবনযাত্রা সহজ সরলভাবে এগিয়ে নিয়ে চলেছে মুখ্যত উদ্ভিদ, গাছপালা থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন উপাদানকে ব্যবহার করে। খাদ্য, বাসস্থান ও অন্যান্য ব্যবহারিক প্রয়োজন থেকে শুরু করে রোগনিরাময় পর্যন্ত বিভিন্ন প্রয়োজনে এইসব প্রান্তিক অঞ্চলের মানুষ উদ্ভিদকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে আছে। উদ্ভিদ বৈচিত্র্যের মূল্যায়ণের ক্ষেত্রে এইসব মানুষের উপলব্ধি যাচাই করা দরকার।

খাদ্য সুরক্ষাকে নিশ্চিত করা, পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের মুখে সুষম আহার তুলে দেওয়া বর্তমানের বিজ্ঞানীদের কাছে একটি কঠিন চ্যালেঞ্জ। বহুল ব্যবহৃত উদ্ভিদকুল ছাড়াও, অপ্রচলিত, অব্যবহৃত (Underutilized) এবং অবহেলিত (Neglacted) উদ্ভিদসমুহও উপযোগী হয়ে উঠতে পারে। বিজ্ঞানীরা সেইদিকে বিশেষ নজর দিয়েছেন। এদের কোনটা খাদ্যের উৎস হিসাবে, রোগনিরাময়ের উপাদান হিসাবে, আবার কোনটা বিভিন্ন ব্যবহারিক দ্রব্যের কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। ফলে প্রচলিত বহুল ব্যবহৃত উদ্ভিদের ওপর প্রয়োজন মেটানোর দায়ভার কিছুটা কমবে। অপ্রচলিত, অব্যবহৃত উদ্ভিদ হলো সেইসব উদ্ভিদ যাদের একসময়ে চাষাবাদ ব্যাপক আকারে হলেও এবং গ্রহনযোগ্যতা প্রমাণিত হলেও বর্তমানে তাদের ব্যবহার ভীষণ কম, আর অবহেলিত উদ্ভিদ হলো সেইসব উদ্ভিদ যেগুলি আমাদের আশেপাশে জন্মালেও তাদের উপযোগিতা সম্পর্কে আমরা বিশেষ ওয়াকিবহাল নই। এদের মধ্যে অনেকেই আবার চাষবাসের আওতায় থাকা উদ্ভিদের সাথে সম্পর্কিত বন্য প্রজাতি বা নিকট আত্মীয়।

খাদ্যসুরক্ষাকে সুনিশ্চিত করতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিচার করা দরকার —

(১) উদ্ভিদ বৈচিত্র্যের যথার্থ মূল্যায়ণ ও দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহার (Sustainable utilization)।

(২) অপ্রচলিত, অব্যবহৃত এবং অবহেলিত উদ্ভিদ তথা চাষযোগ্য উদ্ভিদের বন্য প্রজাতিগুলির (Crop-wild relatives) যথার্থ মূল্যায়ণ।

(৩) সুপরিকল্পিত উদ্ভিদ প্রজনন বিদ্যার প্রয়োগে বন্য ও প্রচলিত উদ্ভিদের মেলবন্ধন ঘটিয়ে উন্নত প্রজাতির সৃষ্টি।

(৪) জৈব প্রযুক্তির প্রয়োগের দ্বারা প্রয়োজনীয় জীন সমুহকে একত্রিত করে উন্নত উদ্ভিদ সৃষ্টি করা।

(৫) প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারী প্রান্তিক আদিবাসী মানুষজনের উদ্ভিদের ব্যবহার সম্পর্কিত জ্ঞানকে ব্যবহার করা।

International Plant Genetic Resources Institute (IPGRI) একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা অপ্রচলিত ও অবহেলিত উদ্ভিদের ব্যবহারের বিষয়ে পৃথিবীব্যাপি সচেতনতা সৃষ্টির জন্য নানা কর্মসূচী ঘোষণা করেছেন। International Centre for Underutilized Crops (ICUC) 1948 সালে স্থাপিত হবার পর খাদ্য, ঔষধি ও পরিবেশগত বিষয়ে অপ্রচলিত উদ্ভিদের অবদান সম্পর্কে অবহিত করে চলেছেন। National Bureau of Plant Genetic Resources (NBPGR), New Delhi একটি সংস্থা, যেখানে বিভিন্ন ফসলের জার্মপ্লাজম (Germplagm) সংরক্ষিত থাকে, সেই সংস্থা অপ্রচলিত ও অব্যবহৃত উদ্ভিদের ওপর নানা রিসার্চ প্রোজেক্টে কাজ শুরু করেছেন।

খাদ্য সুরক্ষায় দানাশষ্য (Cereals) ও ছদ্ম-দানাশষ্যের (Pseudo-cereals) ভূমিকা

পৃথিবীর অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশেই দানাশষ্য প্রধান খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ধান, গম ও ভূট্টা প্রায় ৭৫% দানাশষ্য সরবরাহ করে। বাকী ২৫% সরবরাহ করে কিছু ক্ষুদ্র দানাশষ্য (Minor Cereals), যেমন - ওট (*Avena sativa*), বার্লি (*Hordeum vulgare*), জোয়ার (*Sorghum vulgare*), বাজরা (*Pennisetum glaucum*), রাগী (*Eleusine coracana*), রাই (*Secale cereale*), ইত্যাদি। এইসব দানাশষ্যই একবীজপত্রী Poaceae গোত্রের অন্তর্ভূক্ত। বর্তমানে ছদ্ম-দানাশষ্য বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। ছদ্ম-দানাশষ্য হলো বিভিন্ন গোত্রভূক্ত কিছু দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের বীজ যেগুলি দানাশষ্যের মতোই ব্যবহার করা হয়। দানাশষ্যের সাথে এদের তফাৎ হলো, দানাশষ্যের বীজগুলিকে ফল থেকে আলাদা করা যায় না, আর ছদ্ম-দানাশষ্যে বীজগুলিকে ফল থেকে সহজেই পৃথক করা যায়।

ভিটামিন, প্রোটিন ও প্রোটিনে বর্তমান অ্যামাইনো অ্যাসিডের নিরিখে ছদ্ম-দানাশষ্য, প্রচলিত দানাশষ্যের তুলনায় অনেক বেশি উপযোগী। ট্রিপটোফ্যান, লাইসিন, আরজিনিন ইত্যাদি অত্যাবশ্যক অ্যামাইনো অ্যাসিড দানাশষ্যে অপ্রতুল হলেও ছদ্ম-দানাশষ্যে প্রচুর পরিমাণে থাকে। শুধু তাই নয়, প্রোটিনের ব্যবহারিক গুরুত্বের বিচারে (Net Protien Utilization বা NPU / Protein Efficiency Ratio) প্রচলিত দানাশষ্যের থেকে ছদ্ম-দানাশষ্য কয়েক কদম এগিয়ে। উদাহরণ হিসাবে কিছু ছদ্ম-দানাশষ্যের

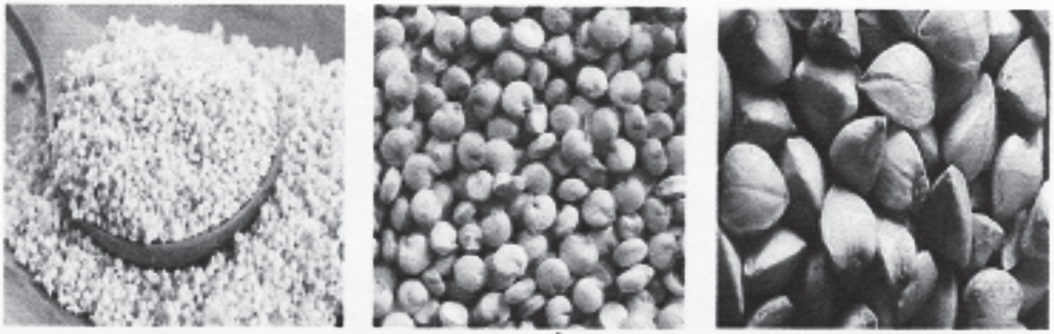

(ক) (খ) (গ)
চিত্র ১

উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, যেমন — *Amaranthus caudatus*, *Amaranthus cruentus*, *Amaranthus hypochondriacus* (Amaran thaceae), *Chenopodium quinoa* (Cheropodlaceae), *Fagopyrum esculentum* (Polygonaceae) (চিত্র-১) ইত্যাদি। এই ছদ্ম-দানাশষ্যগুলির প্রাগৈতিহাসিক যুগেও ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া গেছে। প্রায় ৬০০০ বছর আগে অ্যাজটেক, মায়া ও ইনকা সভ্যতায় এদের ব্যবহার ছিলো। *Amaranthus* এর ছদ্ম দানাশষ্যকে অনেকে 'Grain of future' বলেও অভিহিত করে থাকেন। কিন্তু এই *Amaranthus* এবং *Chenopodium* ভারতবর্ষে সবুজ শাক সবজী হিসাবে বহুল ব্যবহৃত বলেও, ছদ্ম দানাশষ্য হিসাবে এদের ব্যবহার কিছু নির্দিষ্ট অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ — যেমন — উত্তর ভারত, উত্তর-পশ্চিম ভারত ইত্যাদি অঞ্চল। খাদ্য সুরক্ষাকে সুনিশ্চিত করতে এদের ব্যাপক চাষাবাদ জরুরী।

খাদ্যসুরক্ষায় সবুজ শাকপাতার ভূমিকা

বিভিন্ন ধরনের শাকপাতা সমগ্র পৃথিবীজুড়ে বিশেষত South-East Asia, চিন, ভারত, ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ ইত্যাদি অঞ্চলের উষ্ণ, আর্দ্র, ক্রান্তীয় অংশে ব্যাপকভাবে চাষ করা হয়। এইসব উদ্ভিদের পাতা, রসালো কান্ড, কিছু ক্ষেত্রে মূল তরকারি ও সুপে বা শাক হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এইসব শাকসবজী প্রোটিন, ভিটামিন, খনিজ উপাদান, ফাইবার ও অ্যান্টি অক্সিডেন্টে ভরপুর। স্বাস্থ্যরক্ষায় অ্যান্টি অক্সিডেন্টের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন ফ্রি-র‍্যাডিকল্ ও রিঅ্যাকটিভ অক্সিজেনকে প্রতিহত করে স্বাস্থ্যরক্ষার কাজ করে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট। ফ্রি-র‍্যাডিকল দীর্ঘসময় ধরে উৎপন্ন হতে থাকলে তা অনাক্রম্যতা ও প্রোটিনের পরিবর্তন ও DNA কে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে, যার ফলশ্রুতিতে বয়ঃপ্রাপ্তি তরান্বিত হতে পারে।

ভিটামিন C একটি প্রধান অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, এছাড়াও পলিফেনলস, অ্যান্থোসায়ানিন, ক্যারোটিনয়েডস ইত্যাদি অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের ভূমিকা পালন করে। অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের নিরিখে *Amaranthus* প্রথম পাঁচটি শাক সবজীর মধ্যে পড়ে। অপুষ্টি বা Malnutrition তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির বিশেষত আফ্রিকার দেশগুলির এক প্রধান সমস্যা। খাদ্য তালিকায় প্রচলিত ও অপ্রচলিত শাকসবজীর অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে সেই সমস্যা দুর করা যেতে পারে।

ভারতের উষ্ণ আর্দ্র ক্রান্তীয় অঞ্চলে, বিশেষত গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলে দৈনিক খাদ্য তালিকায় শাকের একটি রেসিপি থাকে। বিভিন্ন ধরনের শাক পাতার সাথে আমরা সবাই পরিচিত। যেমন — লালশাক, নটে শাক, পালং শাক, পুঁই শাক, বেথো শাক ইত্যাদি। এরমধ্যে লালশাক ও নটে শাকের জনপ্রিয়তা সর্বাধিক। এই লালশাক ও নটে শাকের বহু উপপ্রজাতি, ভ্যারাইটি, বন্য নিকট আত্মীয় রয়েছে যেগুলির স্বাদ ও পুষ্টিগুণ কমবেশি একইরকম। ব্যাপক জনপ্রিয়তা না পেলেও কিছু কিছু অঞ্চলের স্থানীয় বাজারে এগুলির দেখা মেলে। অঞ্চল ভেদে এদের বিভিন্ন নামও রয়েছে, যেমন — চাঁপা নটে, লক্ষ্মী নটে, পুনকো শাক, সুরেশ্বর ডাটা, ফুলেস্বর ডাটা,

কাটোয়ার ডাটা ইত্যাদি। এই বন্য প্রজাতিগুলির পুষ্টিগুণ ও গ্রহণযোগ্যতা যথাযথভাবে যাচাই করা উচিত যাতে বৃহত্তর পরিসরে এগুলির ব্যবহার শুরু হয়। চারিত্রিক বৈশিষ্ঠ্যের নিরিখে, বিন্যাসবিধির নিয়ম মেনে কিছু বন্য প্রজাতি ও স্থানীয় ভ্যারাইটিকে প্রজাতির স্তরে উন্নিত করা হয়েছে। যেমন — *Amaranthus parganensis*, (সাদা ডাটা বা লাল ডাটা), Amaranthus bengalense Soubhik Das & Iamonico (নটে শাক) (চিত্র ২)। নামের গোলক ধাঁধায় পড়ে উদ্ভিদ সনাক্তকরণে যাতে কোনো সমস্যা না হয় তার জন্য লাল শাকের বিভিন্ন প্রচলিত ও অপ্রচলিত বন্য ভ্যারাইটিগুলিকে, তাদের পৃথক পৃথক নামের পরিবর্তে একটিমাত্র প্রজাতি —

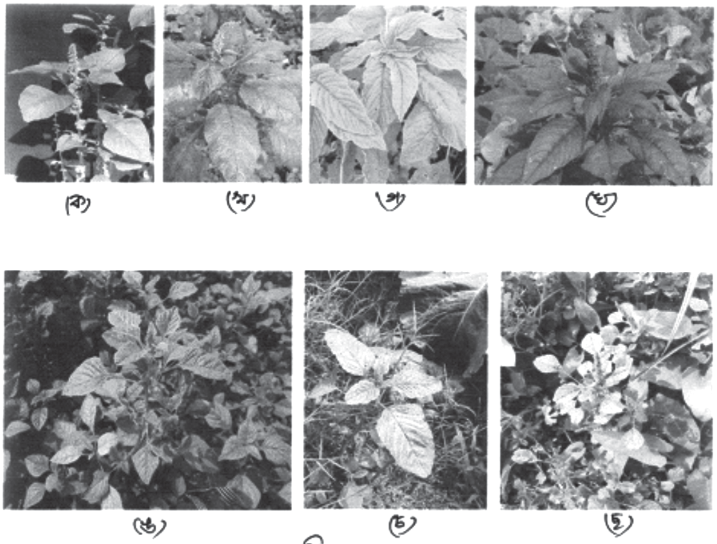

চিত্র ২

Amaranthus tricolor-এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, অর্থাৎ লালশাক, ধুলোশাক, পুনকো শাক, সুরেশ্বর ডাটা, ফুলেশ্বর ডাটা, কাটোয়ার ডাটা এগুলি সবই *Amaranthus tricolor*-এর বিভিন্ন রূপভেদ। (সারণী ১)। পুষ্টিগুণ মূল্যায়ণ করতে গিয়ে দেখা গেছে প্রচলিত জনপ্রিয় কিছু শাক সবজীর তুলনায় (যেমন - পালং শাক, বাঁধাকপি) লাল শাক বা নটে শাক, পুষ্টিগুনে সমতুল বা অধিকতর পুষ্টিগুণ সম্পন্ন, (সারণী ২)। এই ধরনের শাকপাতা চাষের একটি বড়ো সুবিধা হলো, এদের চাষ পদ্ধতি খুবই সরল, বিশেষ ধরনের

সারণী ১. লালশাক ও নটে শাকের বিভিন্ন প্রজাতি ও ভ্যারাইটি ও তাদের পরিচিতি

প্রচলিত নাম	বিজ্ঞানসম্মত নাম	পরিচিতি
১) নটে শাক	*Amaranthus bengalense* Saubhik Das & Iamonico	বহুল পরিচিত
২) চাঁপা নটে	*Amaranthus blitum* var. blitumL.	নটে শাকের বন্য ভ্যারাইটি
৩) লক্ষ্মী নটে	*Amaranthus blitum* var *oleraceus* L.	নটে শাকের বন্য ভ্যারাইটি
৪) লাল ডাটা, সাদা ডাটা	*Amaranthus parganansis* Saubhik Das	লাল শাকের বন্য প্রজাতি

৫) ধুলো শাক বা পুনকো শাক	*Amaranthus tricolor* var. *acutus* S. Das	লাল শাকের বন্য ভ্যারাইটি
৬) লাল শাক, সুরেশ্বর ডাটা ফুলেশ্বর ডাটা	*Amaranthus tricolor* var. *tricolor* L.	বহুল পরিচিত
৭) কাটোয়ার ডাটা	*Amaranthus tricolor* var. *tristic* L.	বহুল পরিচিত

সার, বিশেষ কৃষিজ পদ্ধতি, বা উর্ব্বর মৃত্তিকার প্রয়োজন হয় না, ক্ষেতের ধারে অন্যান্য ফসলের সাথে, এমনকি আবর্জনাময় স্থানেও এরা জন্মাতে পারে। বিগত বছরে মাটিতে পড়ে থাকা বীজ থেকে পরের বছর নতুন গাছ জন্মাতে পারে।

লালশাক, নটে শাক ছাড়াও আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ জনপ্রিয় শাক হলো — পুঁইশাক ও বেথো শাক। যে পুঁইশাক (*Basella alba*)

সারণী ২. Amaranthus এর অন্তর্গত বিভিন্ন শাকের সাথে জনপ্রিয় ২টি শাক সবজীর তুলনা।

পুষ্টি উপাদান	বাঁধাকপি প্রতি ১০০ গ্রামে	চাইনিজ বাঁধাকপি প্রতি ১০০ গ্রামে	পালং বাঁধাকপি প্রতি ১০০ গ্রামে	*Amaranthus* প্রতি ১০০ গ্রামে
(A) প্রোটিন (গ্রাম)	১.২৮	১.২	২.৮৬	২.৪৬
(B) খনিজ উপাদান				
ক্যালশিয়াম (mg)	৪০	৭৭	৯৯	২১৫
আয়রণ (mg)	০.৪৭	০.৩১	২.৭১	২.৩২
ম্যাগনেশিয়াম (mg)	১২.০	১৩.০	৭৯.০	৫৫.০
ফসফরাস (mg)	২৬.০	২৯.০	৪৯.০	৫০.০
পটাশিয়াম (mg)	১৭০.০	২৩৮.০	৫৫৮.০	৬১১.০
সোডিয়াম (mg)	১৮.০	৯.০	৭৯.০	২০.০
জিঙ্ক (mg)	০.১৮	০.২৩	০.৫৩	০.৯০
কপার (mg)	০.০২৯	০.০৩৬	০.৯৩৬	০.১৬২
ম্যাঙ্গানিজ (mg)	০.১৬০	০.১৯০	০.৪৯৭	০.৮৮৫
(C) ভিটামিন (mg)				
ভিটামিন C (mg)	৩৬.৬	২৭.০	২৮.০	৪৩৩
রাইবোফ্লভিন (mg)	০.০৪০	০.০৫০	০.১৮৯	০.১৫৮

নিয়াসিন (mg)	০.২৩৪	০.৪০০	০.৭২৩	০.৬৫৮
ভিটামিন B_6 (mg)	০.১২৪	০.২৩২	০.১৯৫	০.১৯২
ফোলিক অ্যাসিড (mcg)	৪৩.০	৭৯.০	১৯৪.০	৮৫.০
ভিটামিন A (mcg)	৫.০	১৬.০	৪৬৯.০	১৪৬.০
ভিটামিন K (mcg)	৭৬.০	৪২.৯	৪৮২.৯	১১৪০.০
(D) সম্পৃক্ত ফ্যাক্ট (g)	০.০৩৪	০.০৪৩	০.০৬৩	০.০৯১

আমরা সচরাচর দেখি, সেটি ছাড়াও আর এক ধরনের লতানো বন্য ভ্যারাইটি আছে সেগুলির কান্ড সরু, পাতাগুলি ছোটো হৃৎপিন্ডাকার। অন্যদিকে প্রচলিত জনপ্রিয় পুঁইশাক মাটির ওপর শায়িত হয়ে বাড়ে, কান্ডটি বেশ মোটা, পাতাগুলি বড়ো গোলাকার। বন্য ভ্যারাইটিটি (*Basella alba* var. *Corditolia*) বাজারে বিক্রিত পুঁইশাকের তুলনায় বেশি সুস্বাদু। কিন্তু পরিচিতির অভাবে জনপ্রিয়তা পায়নি। গ্রাম বাংলায় বেথো শাক (*Chenopodium album* L.) বেশ জনপ্রিয় (চিত্র ৩)। এর তিনটি সাইটোটাইপ রয়েছে — ডিপ্লয়েড, টেট্রাপ্লয়েড ও হেক্সাপ্লয়েড। এরমধ্যে উৎকর্ষের বিচারে হেক্সাপ্লয়েড সাইটোটাইপটি শাক হিসাবে বেশি পরিচিত, বাকীগুলি সবই বন্য।

নিউট্রিয়েন্ট (Nutrient) ও অ্যান্টিনিউট্রিয়েন্ট (Antinutrient) উপাদান

চিত্র ৩

খাদ্যগুনের কারণে শাকসবজী আমাদের খাদ্যতালিকার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, তবে কিছু অ্যান্টিনিউট্রিয়েন্টের উপস্থিতি যেমন — অক্সালিক অ্যাসিড, নাইট্রেটস ইত্যাদি প্রায় সব শাক সবজীরই গ্রহনযোগ্যতা সামান্য হলেও ব্যাহত করছে। অত্যাধিক পরিমাণে অক্সালিক অ্যাসিডের উপস্থিতি কিছু খনিজ পদার্থের বিশেষত ক্যালশিয়ামের আত্তীকরণকে ব্যাহত করে। ক্যালশিয়াম ও অক্সালেটের সমন্বয়ে তৈরি ক্যালশিয়াম অক্সালেট কিডনিতে সঞ্চিত হয়ে কিডনি স্টোন সৃষ্টি করতে পারে। পাচন তন্ত্রে বিভিন্ন নাইট্রেটস ক্ষতিকারক নাইট্রোসামাইন যৌগে পরিণত হতে পারে যা এক ধরনের ক্যানসার সৃষ্টিকারী উপাদান। কিন্তু এর স্বপক্ষে

কোনো তথ্য দেওয়া যায়নি। গবেষণায় দেখা গেছে দৈনিক ২০০ গ্রাম রান্না করা লাল শাক বা নটে শাক খেলেও কোনো শারীরিক ক্ষতি হয়না। বর্তমানে বায়োটেকনোলজিকে ব্যবহার করে জিন প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে ট্রান্সজেনিক লালশাক তৈরি করা গেছে। অক্সালেট ডিকা বক্সিলেজ নামক এনজাইমটি ক্ষতিকারক অক্সালিক অ্যাসিডকে ভেঙ্গে দিতে পারে। অক্সালেট ডিকা বক্সিলেজ জিনটি তিনে প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে শাক সবজীতে অক্সালেটের মাত্রা কমানো সম্ভব।

খাদ্য সুরক্ষাকে সুরক্ষিত ও মজবুত করতে, অপুষ্টির থাবা থেকে ভবিষ্যত প্রজন্মকে রক্ষা করতে সবুজ শাক সবজীর কোনো বিকল্প নেই। সেক্ষেত্রে গ্রহনযোগ্য শাকসবজীর তালিকাটি দীর্ঘ করা প্রয়োজন। সেই লক্ষ্যে সমস্ত চাষযোগ্য শাক সবজীর অপ্রচলিত, অবহেলিত ভ্যারাইটি ও বন্য প্রজাতির অঙ্গ সংস্থানিক, পুষ্টি মূল্যের সাথে অ্যান্টিনিউট্রিয়েন্ট উপাদানের মূল্যায়ন প্রয়োজন, যাতে উপযুক্ত গ্রহনযোগ্য ভ্যারাইটি বা প্রজাতিগুলিকে সনাক্ত ও তালিকাভুক্ত করা যায়।

ভাষা আন্দোলনের সূচনার দিনগুলি

ড. উত্তম কুমার দাস
অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ

পাকিস্তান সৃষ্টির ঠিক ছয়মাস দশ দিন পর করাচীতে পাকিস্তান গনপরিষদের প্রথম অধিবেশনে পরিষদের ব্যবহার্য ভাষা কী হবে সে সম্পর্কে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত হয় ১৯৪৮ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারি বিষয়টি নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অধিবেশন শুরু হলে শুরুতে আলোচনার সূত্রপাত করে পূর্ববাংলার কংগ্রেস দলীয় সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বলেন Mr. President, Sir, I move: “That in sub-rule (1) of rule 29, after the word 'English' in line 2, the words 'or Bengalee' be inserted.” তিনি বলেছিলেন বাংলা একটি প্রাদেশিক ভাষা হলেও সমগ্র পাকিস্তানের মোট ৬ কোটি ৯০ লক্ষ লোকের মধ্যে ৪ কোটি ৪০ লক্ষ লোক বাংলা ভাষায় কথা বলে, অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী বাঙালি। অথচ ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে পাকিস্তান সরকার যে ভূমিকা পালন করছে তা মোটেই সমর্থনর্থযোগ্য নয়। ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমাণ দিয়ে দেখান, পোস্টঅফিসের মাধ্যমে টাকা পাঠাতে গেলে যে ফর্ম পূরণ করতে হয় সেটি মুদ্রিত উর্দুভাষায়; খামও পোস্টকার্ডের উপরে ছাপানো ভাষা উর্দু; জমি কেনা বেচার জন্য ভেন্ডারএর কাছ থেকে যে স্ট্যাম্প কিনতে হয়, সেটিও উর্দুভাষায়। ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের এই সমস্ত উদাহরণের মধ্য দিয়ে একটা মহৎ সত্য উচ্চারিত হয়; আর সেটি হল বাংলা হতে পারে পাকিস্তানের লিঙ্গুয়াফ্রাঙ্কা, অর্থাৎ উভয় প্রদেশের মধ্যে ভাষার মাধ্যমে যোগাযোগের মাধ্যম। শ্রী দত্ত একথা জানাতে ভোলেননি যে সেদিন গণপরিষদে যে ভাষায় বিতর্ক চলছে তা সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের বোধগম্য নয়। আবেগতাড়িত কণ্ঠে তিনি জনসংখ্যার অনুপাতে বাংলার সপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করতে গিয়ে একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উপস্থাপন করেন; যেটি পরবর্তীকালে সমগ্র বাংলা ভাষাভাষী মানুষের প্রাণের দাবীতে পরিণত হয়। যেহেতু পাকিস্তানের ৬ কোটি ৯০ লক্ষ জনগণের মধ্যে ৪ কোটি ৪০ লক্ষই বাঙালি, সেজন্যে তাঁর সঙ্গত প্রশ্ন Sir, what should be the State Language of the State? The State Language of the State should be the Language which is used by the majority of the people of the State.'

ভাষা সম্পর্কিত একটি নির্দোষ আলোচনা প্রস্তাব যে শেষপর্যন্ত রাষ্ট্রভাষার দাবীতে পর্যবসিত হয়, তার প্রমাণ পাওয়া যায় ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত-লিয়াকত আলী খানের তর্ক যুদ্ধে। শ্রী দত্ত দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানান, “So, Sir, I know I am voicing the sentiments of the vast millions of our State and therefore Bengalee should not be treated as a Provincial Language. It should be treated as the language of the State. শেষবাক্য It should be treated as the language of the state-ই ঘোষণা দেয় রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। ১৯৪৮ সালের সেই দাবী তুঙ্গে ওঠে ঠিক চারবছর পর; ২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২ সালে। পরিষদ নেতা পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান প্রথমে ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের এই প্রস্তাবটিকে নির্দোষ ভেবেছিলেন, কিন্তু শ্রী দত্তের সংশোধনী প্রস্তাবের পর তিনি এর মধ্যে ষড়যন্ত্রের আভাস পেলেন, তার মনে হল এই দাবি পরবর্তীকালে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করবে,পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। তাই তিনি বার বার স্মরণ করিয়ে দিলেন পাকিস্তান যেহেতু একটি মুসলিম রাষ্ট্র, সেজন্যে ভাষার ক্ষেত্রেও ধর্মীয় চরিত্র রক্ষা করার জন্যে উর্দুর প্রধান্য থাকা প্রয়োজন। যেহেতু পূর্বও পশ্চিম পাকিস্তানের দুই অংশেই মুসলমানদের সংখ্যা বেশি, সেজন্য রাষ্ট্র ভাষার ক্ষেত্রে উর্দুর প্রাধান্য থাকা আবশ্যিক; যদিও তিনি প্রাদেশিক ভাষা হিসেবে প্রদেশের সব মানুষের কথ্য,লিখিত ও ব্যবহৃত ভাষা বাংলা ব্যবহার প্রসঙ্গে আপত্তি তোলেন নি; তথাপি মূল আলোচনা অর্থাৎ বাংলার ভাষার রাষ্ট্রীয় অধিকার অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাবেই ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে ভারতীয় চর,কম্যুনিস্ট, বিচ্ছিন্নতাবাদী ইত্যাদি নামে অভিহিত করেছিলেন। লিয়াকত আলী খানের বক্তব্য ছিলো সাম্প্রদায়িকতাপূর্ণ। দুর্ভাগ্যজনক সত্য হচ্ছে, কোনো বাঙালি মুসলিমলীগ সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে সমর্থন জানাননি, বাংলার পক্ষে বক্তব্য রাখেন নি। এমনকি সংসদের বাঙালি স্পীকার তমিজউদ্দিন খান ও শেষে রায় দিয়েছেনঃ 'Sir, I cannot accept this amendment.' ১৯৪৮ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদে ভাষা - বিতর্কে শেষ বাক্যটি হচ্ছে 'The Motion was negative.'

কিন্তু সেই negative-ই কতোখানি positive হয়ে উঠতে পারে তার প্রমাণ পাওয়া যায় কয়েকদিন পরেই। বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 'স্মৃতিঃ ১৯৭১'-এর তৃতীয় খন্ডে ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের নাতনি আরমা দত্ত ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে উদ্ধৃত করে লিখছেন "প্রথম গণপরিষদ অধিবেশন শেষে করাচী থেকে ফিরলাম। অনুন্নত তেজগাঁ বিমানবন্দরে সিকিউরিটি বলতে কিছুই নেই। প্লেন থেকে নেমে দেখলাম, প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ জন যুবক এক জায়গায় দাঁড়িয়ে। তাদের প্রত্যেকের গায়ে চাদর। আমার ধারণা হলো,গণপরিষদে বাংলার স্বপক্ষে কথা বলার দরুণ এরা বিক্ষোভ জানাতে এসেছে,এদের চাদরের আড়ালে অস্ত্রও থাকতে পারে। সংশয় নিয়ে এগিয়ে গেলাম। যখন ওদের একেবারে নাগালের মধ্যে চলে গেছি তখন হঠাৎ প্রত্যেকে চাদরের তলা থেকে রাশিরাশি ফুল বের করে আমার ওপর বর্ষণ করতে লাগলো। ওরা সবাই ছিলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র।" সেই সূচনা এরপরই ১১ই মার্চ ১৯৪৮, পূর্ববাংলায় 'ভাষাদিবস' পালিত হলো; এবং ওই মার্চেই ২১ তারিখে ঢাকা রেসকোর্স ময়দানে, বর্তমানে যেটি সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ সেখানে প্রথম ঘোষণা করলেন Urdu, and Urdu shall be the state language of Pakistan ২৪ মার্চ তারিখে সেই একই ঘোষণা তিনি পুনরাবৃত্তি করলেন কার্জন হলে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে; এবং ঐতিহাসিক ঘটনা হচ্ছে রেসকোর্স ময়দানে জিন্নার উক্তিতে ছাত্রদের যে 'নো', 'নো' প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়েছিলো, তা কার্জন হলে দ্বিগুণ ধ্বনিতে উচ্চারিত হলে থমকে গিয়েছিলেন জিন্না, স্তম্ভিত হয়েছিলেন তিনি। বলাবাহুল্য, ছাত্রদের এই সাহসের গোড়াপত্তনটি করেছিলেন ধীরেন্দ্রনাথদত্ত।

পাকিস্তানের নেতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ দৃঢ় আস্থার সঙ্গে ঘোষণা করেছিলেন 'Pakistan has come to stay'; কিন্তু ২৪ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই ১৯৭১ সালে পূর্ববাংলার বাঙালি প্রমাণ করে ছাড়লেন 'Pakistan has come to be divided' বলাবাহুল্য এই সাফল্যে উপনীত হওয়ার মূলে ছিল ১৯৪৮ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারির পূর্বোক্ত গণপরিষদের ব্যবহার্য ভাষাবিষয়ক আলোচনার সূচনা। বলা চলে শুভ সূচনা। এ প্রসঙ্গে বলা দরকার ১৯৫৬ সালে তথাকথিত ইসলামিক রিপাবলিক অব পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হলেও কার্যক্ষেত্রে তা ছিলো চরমভাবে অবহেলিত; এসময় দেখা যায় আরবী হরফে বাংলা, রোমান হরফে বাংলা, সোজা বাংলার নামে সওজা বাংলা, বাংলাভাষার মধ্যে দুর্বোধ্য আরবী-ফার্সী-উর্দুভাষার আমদানী ঘটানো হয়েছে অবাধে। আত্মাভিমাণী বাঙালি জাতি তাদের মাতৃভাষার এই অবমাননা মেনে নিতে পারে নি। পরোক্ষে এটি তাদেরকে জাতীয়তাবোধে অনুপ্রানিত করেছিল। বন্ধু হিসাবে প্রতিবেশি ভারতকে পাশে পেয়ে পূর্ব পাকিস্তান নিজেদের স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিয়েছিল, রক্তগঙ্গায় স্নান করে জন্ম হয়েছিল স্বাধীন বাংলাদেশের।

এই রক্তগঙ্গার অন্যতম শিকার শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। ৮৫ বছরের বৃদ্ধ কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে কী অমানবিক অত্যাচারের শিকার হয়েছিলেন, এক সাক্ষাৎকারে সেই বিবরণ দিয়েছেন কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টের নাপিত রমণীমোহন শীল। সাখাওয়াত আলীখান প্রদত্ত এক সাক্ষাৎকারে জানা যায়ঃ "ধীরেনবাবু সম্পর্কে বলতে গিয়ে রমণী শীলের চোখের জল বাঁধ মানেনি। মাফলারে চোখ মুছে তিনি বলেন, 'আমার সে পাপের ক্ষমা নেই। বাবু স্কুলঘরের বারান্দায় অতিকষ্টে হামাগুড়ি দিয়ে আমাকে জেজ্ঞেস করেছিলেন কোথায় প্রস্রাব করবেন। আমি আঙ্গুল দিয়ে ইশারায় তাকে প্রস্রাবের জায়গা দেখিয়ে দিই। তখন তিনি অতিকষ্টে আস্তে আস্তে হাতে একটি পা ধরে সিঁড়ি দিয়ে উঠানে নামেন। তখন ঐ বারান্দায় বসে আমি এক জল্লাদের দাড়ি কাটছিলাম। আমি বার বার বাবুর দিকে অসহায় ভাবে তাকাচ্ছিলাম বলে জল্লাদ উর্দুতে বলে, 'এটা একটা দেখার জিনিস নয়-নিজের কাজ কর।' এরপর বাবুর দিকে আর তাকাবার সাহস পাইনি। মনে মনে শুধু ভেবেছি বাবু জনগণের নেতা ছিলেন, আর আজ তাঁর কপালে এই দুর্ভোগ। তাঁর ক্ষতবিক্ষত সমস্ত দেহে তুলা লাগ্যানো, মাথায় ব্যান্ডেজ, চোখ ও হাত বাঁধা অবস্থায় উপর্যুপুরি কয়েক দিনই ব্রিগেড অফিসে আনতে নিতে দেখি।" তিনি নিখোঁজ হন ১৯৭১ সালের ২৯শে মার্চ। অসমর্থিত সূত্রে জানা যায়, ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে শহীদ হন ১৪ই এপ্রিল, ১৯৭১। আসলে ১৯৪৮ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারি তারিখে করাচীতে পাকিস্তান গণপরিষদে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত যে দুঃসাহসিক ভূমিকা পালন করেছিলেন তা পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী তথা সামরিক জান্তা ভোলেনি, ভুলতে পারেনি। তাঁর রক্তে সিঞ্চিত হয়েছিল বাংলাদেশের মাটি ।

মহাবিশ্ব দর্শন — জেমস্ ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ

ড. রমা প্রসাদ আদক
অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, পদার্থবিদ্যা বিভাগ

মানুষের অচেনাকে চেনার ইচ্ছা তাকে সভ্যতার অগ্রগতির দিকে আরও এক একটি করে ধাপ এগিয়ে দিয়েছে। বিজ্ঞানী নীল আর্মষ্ট্রং চাঁদে পা ফেলে বলেছিলেন "That's one small step for man, one giant leap for mankind" — ''এটি মানুষের একটা ছোট পদক্ষেপ যা মানবজাতির জন্য এক বৃহৎ অগ্রসর।" আজ বিজ্ঞানীদের জানার জগৎ চন্দ্রালোক ছাড়িয়ে সৌরজগত ছাড়িয়ে, মহাবিশ্বের সৃষ্টি সন্ধানে গবেষণারত। আকাশ তথা মহাকাশ পর্যবেক্ষণের সূত্রপাত খ্রীষ্টপূর্বাব্দেই শুরু হয়েছিল। প্রাচীন বিজ্ঞান হল জ্যোর্তিবিজ্ঞানই। ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে গ্যালিলিও-র দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার জ্যোর্তিবিজ্ঞানের গবেষণায় এক বড়সড় অগ্রস্রর ঘটায়। পরবর্তীকালে এই দূরবীক্ষণ যন্ত্রের প্রভূত উন্নতিসাধন করে বর্তমানে ভূমিস্থাপিত (Ground based) দূরবীক্ষণের সাহায্যে গবেষণা করা হয়। সাধারণ দূরবীক্ষণ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করে স্বয়ং গ্যালিলিও-ই চাঁদের কলঙ্ক, বৃহঃস্পতির উপগ্রহ, শনির বলয়, সৌর কলঙ্ক পর্যবেক্ষণ করেন, তিনি আকাশগঙ্গা (Milky way) এবং আরও অনেক ছায়াপথ ও নীহারিকা পর্যবেক্ষণ করেন। পৃথিবী থেকে মহাকাশ পর্যবেক্ষণের প্রধান সমস্যা হল — পৃথিবীর আবহাওয়া মণ্ডল। পৃথিবীর আয়ন মন্ডল (Ion Sphere), ওজোন মণ্ডল (Ozone Sphere) দ্বারা আলোকরশ্মির বেশিরভাগ অংশ শোষিত হয়ে যায়। আবার পৃথিবীর বায়ুদূষণ এবং শহরের আলোকে অনেক নক্ষত্রকে দেখা যায় না। তাই মহাকাশ পর্যবেক্ষণ স্থল গুলি উঁচু পাহাড়ের উপরে করা হয়। বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরগুলির উষ্ণতা দ্রুত পরিবর্তিত হতে থাকে ফলে তারাদের স্পষ্ট দেখা যায় না। একটি বিন্দু দেখার বদলে একটি ছোট বল (Disk) এর মত দেখায় ফলে বিশ্লেষণ ক্ষমতা (Resolution) কমে যায়। উন্নত মানুষ, এর সমাধান করেছে সহজেই। দূরবীক্ষণকে মহাকাশে উপগ্রহের উপর স্থাপন করেছে।

মহাকাশে স্থাপিত প্রথম বড়ো দূরবীক্ষণ (Space Telescope) হল আমেরিকার নাসা (NASA) কর্তৃক প্রেরিত হাবল স্পেস টেলিস্কোপ (Hubble Space Telescope)। যা ১৯৯০ সালে আমেরিকার ফ্লোরিডার 'কেপ কেনেডি' মহাকাশ কেন্দ্র থেকে উৎক্ষেপন করা হয়। এটি পৃথিবীর উপরে ৫৪০ কিমি উপরে ৯২ মিনিটে একবার পৃথিবীকে পরিক্রমা করতে থাকে। আমরা আলোক বর্ণালীর বেগুনী রং থেকে শুরু করে নীল, আকাশী, সবুজ, হলুদ, কমলা হয়ে লাল রং অবধি (বেণীআসহকলা) দেখতে পাই। এই সীমার বাইরের আলো মানুষ দেখতে পায় না। অর্থাৎ অতিবেগুনীর থেকে কম বা অবলোহিতের থেকে বড় তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোক। বস্তুর উষ্ণতা বা শক্তি কম হলে তা থেকে অবলোহিতের থেকে বেশি তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো নির্গত হয়। 'হাবল' স্পেস টেলিস্কোপ দিয়ে অসংখ্য নক্ষত্র, ছায়াপথ, নীহারিকা ইত্যাদির সুস্পষ্ট ছবি পাওয়া গেছে যা দিয়ে আমরা আমাদের জ্যোর্তিবিজ্ঞানের পরিধি আরোও প্রসারিত করতে পেরেছি। একটি সাধারণ দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্যে দুটি কাঁচের লেন্স থাকে। একটি লেন্স চোখের কাছে, এটিকে Eye-lens বলা হয়। দূরের টিকে Field-lens বলা হয়। এই দুটি লেন্সের মধ্যে দূরত্ব পরিবর্তন করে স্পষ্ট দর্শন (ফোকাস) করা হয়। নক্ষত্রগুলি যেহেতু চলমান, তাই এই দূরবীণকেও সামান্য সামান্য করে দিক পরিবর্তন করতে হয় যখন একটি নির্দিষ্ট নক্ষত্রকে পর্যবেক্ষণ করা হয়।

তবে এই প্রবন্ধে আলোচনা করবো, সর্বাধুনিক স্পেস টেলিস্কোপ 'জেমস্ ওয়েব' নিয়ে। এটি দিয়ে হাবল টেলিস্কোপের থেকেও অধিক সুক্ষাতিসুক্ষ পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয়েছে। অনেক দূরের অনেক পুরানো, আবছা নক্ষত্রের ছবি তোলা সম্ভব জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপে (JWST)। নাসার দ্বিতীয় প্রশাসক জেমস এডউইন ওয়েব-এর নামানুসারে এটির নামকরণ করা হয়েছে।

সম্প্রতি ২০২১ সালে উৎক্ষেপিত জেমস্ ওয়েব টেলিস্কোপের মূল চারটি উদ্দেশ্য হল — (ক) বিশ্বসৃষ্টির সময়ের প্রথম দিকের নক্ষত্র ও ছায়াপথের আলোর অনুসন্ধান করা, (খ) ছায়াপথের উৎপত্তির কারণ ও তাদের বিবর্তন, (গ) নক্ষত্র ও গ্রহের জন্মের সঠিক পদ্ধতির অনুসন্ধান, (ঘ) গ্রহের গতির সত্যানুসন্ধান ও মহাবিশ্বে প্রাণের সন্ধান। — JWST কিন্তু পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘোরে না। এটি পৃথিবী থেকে প্রায় ১৫ লক্ষ কিমি দূরে অবস্থিত, পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্বের প্রায় ৪ গুণ বেশি দূরে। এর যেদিকটি সূর্যের দিকে থাকে তা সূর্যের কিরণে উত্তপ্ত হয়। তার জন্য উপযুক্ত তাপরোধী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। JWST এর যন্ত্রপাতির তাপমাত্রা -223^{0}C এ রাখা হয়। সূর্য ও পৃথিবীর আকর্ষণ বল যেখানে অভিকেন্দ্রিক আকর্ষণ বলের সমান হয় সেই ল্যাগরেঞ্জিয়ান L_2 পয়েন্ট হল JWST এর কক্ষপথ। এই পথে আবর্তন করতে নিম্নতম শক্তির প্রয়োজন। JWST প্রায় ৬ মাসে, একবার পৃথিবী ও সূর্যগামী অক্ষের চারিদিকে পূর্ণ প্রদক্ষিণ করে, যদিও এটি সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্বের থেকেও ১৫ লক্ষ কিমি দূরে অবস্থিত তবুও এটি সূর্যকে কেন্দ্র করে ১ বছরে পূর্ণ আবর্তন করে। এটির আবর্তনতল পৃথিবীর মতো সমতল নয়, কক্ষপথটি তরঙ্গের মত ঢেউ খেলানো (Sinusoidal)।

মহাবিশ্ব সৃষ্টির তত্ত্ব — 'Big Bang Theory', অনুযায়ী মহাবিশ্ব একটি আদি বিন্দু থেকে সৃষ্টি হয়ে ক্রমশ প্রসারণশীল। বিজ্ঞানীদের গণনা অনুযায়ী মহাবিশ্ব ইতিমধ্যে ১৩৭৭ কোটি আলোকবর্ষ দূরত্বে প্রসারিত হয়েছে। মহাবিশ্বের আদিতম আলোক অর্থাৎ Big Bang বিস্ফোরণের আলোক ইতিমধ্যে ১৩৭৭ কোটি বছর সময় অতিক্রান্ত হয়েছে, এই ক্ষীণ আলোক জেমস্ টেলিস্কোপ দিয়ে ধরা যেতে পারে। ফলে মহাবিশ্ব কিভাবে, কবে সৃষ্টি হয়েছিল, তার হদিশ দেবে এই টেলিস্কোপ। আমরা জানি, গ্যাস ও ধূলিকণা জমাট বেঁধে বেঁধে নক্ষত্রের জন্ম দেয়, কিন্তু এর নির্ভুল ব্যাখ্যা আজও অজ্ঞাত।

নীহারিকা থেকে নক্ষত্র সৃষ্টির প্রাথমিক পর্যায়ের উষ্ণতা কম এবং এর তরঙ্গদৈর্ঘ্য অবলোহিত অঞ্চলে (Infra Red) অবস্থিত। এই আলোক দীর্ঘপথ অতিক্রম করে ক্ষীণ, দুর্বল হয়ে পড়ে, 'হাবল' টেলিস্কোপে তা ধরা যায় না। জেমস্ টেলিস্কোপের সাহায্যে, আমরা খালি চোখে সবথেকে ঝাপসা যে নক্ষত্র দেখি তার হাজার কোটি ভাগের কম উজ্জ্বলতার নক্ষত্র দেখা সম্ভব। 'CEERS – 93316',— নামক একটি ছায়াপথ আবিস্কৃত হয়েছে যেটি 'বিগ ব্যাং'য়ের ২.৩৫ কোটি বছর পরে সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমান মহাবিশ্বের বয়স বিজ্ঞানীরা গণনা করেছেন ১৩৭৭ কোটি বছর। সুতরাং আশা করা যায়, আরও পুরানো ছায়াপথ জেমস্ টেলিস্কোপ দ্বারা আবিস্কৃত হবে।

আমেরিকা, কানাডা ও ইউরোপের অসংখ্য বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টায় ২০২১ সালে উৎক্ষেপিত হয়ে প্রায় ১ মাস মহাশূন্যে ভ্রমণ করে জেমস্ টেলিস্কোপকে তার Halo কক্ষপথে স্থাপিত করা হয়। এটিকে সূর্য, পৃথিবী ও চাঁদের আলো থেকে রক্ষা করার জন্য তাপরোধী ঢালের উল্টোদিকে রাখা হয়। টেলিস্কোপটি মুখ্য দর্পণের ব্যাস ৬.৫ মিটার, এটির ওজন ৬৫০০ কেজি, এটি মূলত সৌরশক্তি দ্বারা চালিত। এর যন্ত্রপাতি চালানোর জন্য সোলার প্যানেল লাগানো থাকে। এটিকে তার কক্ষপথে সঠিক অবস্থানে রাখার জন্য জ্বালানী ব্যবহার করা হয়। এটি প্রায় ১০ বছর কাজ করবে। এটি ১২ জুলাই ২০২২ সালে প্রথম মহাবিশ্বের আশ্চর্য সব ছবি পাঠাতে থাকে। এটিতে মূলত চার ধরণের যন্ত্র আছে — অবলোহিত ক্যামেরা, অবলোহিত স্পেকট্রোগ্রাফ, মধ্য-অবলোহিত যন্ত্র এবং অসংখ্য সংবেদী কোষ (সেন্সর)। জেমস্ ওয়েব টেলিস্কোপের প্রাথমিক দর্পণটি ১৮টি ষড়ভুজাকার দর্পণের সমন্বয়ে গঠিত। দর্পণগুলি হালকা ধাতু বেরিলিয়াম দ্বারা তৈরি এবং পাতলা সোনার আবরণ দেওয়া। 'নর্থরোপ গ্রুম্যান বল এ্যারোস্পেস' নামক কোম্পানী নির্মিত এই টেলিস্কোপ তৈরি করতে এক হাজার কোটি মার্কিন ডলার খরচ হয়েছে। ২০২২ সালের ১১ই জুলাই মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের হাত দিয়ে এই টেলিস্কোপ প্রেরিত চিত্রের শুভ উন্মোচন হয়েছে। প্রথম ১০ বছর গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলি অংশগ্রহণকারী বিজ্ঞানীরা বিশ্লেষণ করবেন। এখনও পর্যন্ত চমৎকার, স্পষ্ট চিত্রে বিভিন্ন ছায়াপথ, নীহারিকা, নক্ষত্র, গ্রহ দেখা গেছে। —

(বামদিক থেকে ডানদিকে)

চিত্র-১-এ ক্যারিনা নীহারিকাতে নক্ষত্রের জন্ম হচ্ছে।

চিত্র-২- দক্ষিণা রিং নীহারিকা (Southern Ring Nebula) মধ্যে দুটি যুগ্ম-তারা দেখা যাচ্ছে, যেখানে একটি মৃত নক্ষত্র ধুলিকণার মেঘ ছড়াচ্ছে পৃথিবী থেকে ২৫০০ আলোকবর্ষ দূরে।

চিত্র-৩- স্টিফানের ছায়াপথ পঞ্চক (Stephan's Quintet) — পাঁচটি ছায়াপথের সমষ্টি, ভবিষ্যতে যারা একীভূত হয়ে যাবে। এগুলি ৩৯০ লক্ষ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত।

চিত্র-৪- নতুন গ্রহের অনুসন্ধানের বর্ণালী চিত্র। WASP-96b — যেখানে একটি নক্ষত্রের চারিদিকে প্রদক্ষিণরত গ্রহের বর্ণালীতে জলের উপস্থিতি নিশ্চিত করেছে। এটি ১১৫০ আলোকবর্ষ দূরে।

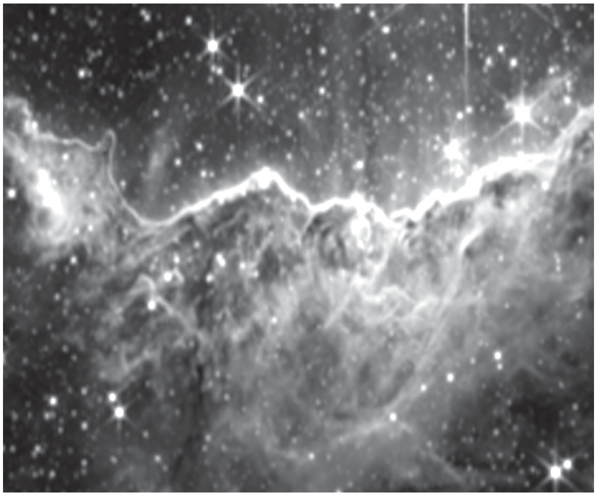

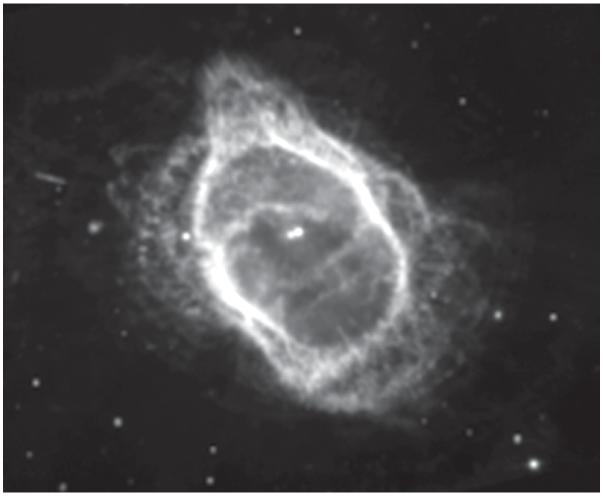

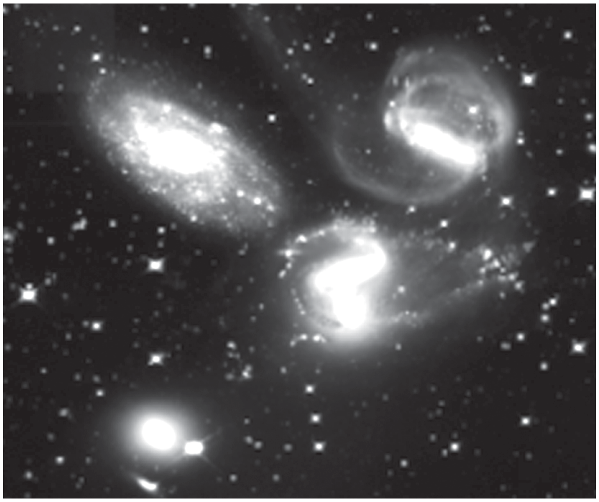

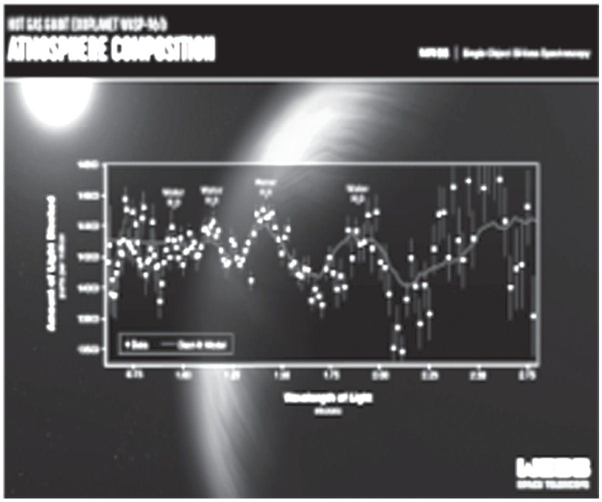

ফাহিয়েন ভারতভ্রমণ-ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে

সায়ন মণ্ডল
৫ম সেমেস্টার, ইতিহাস বিভাগ (অনার্স)

ষাট বছর বয়সে মানুষ অবসর গ্রহণ করে। এমন একজন ব্যক্তি ৬৩ বছর বয়সে কয়েক হাজার কিলোমিটার পদব্রজে চিন থেকে ভারতে আসেন তিনি হলেন ফাহিয়েন (337AD-422AD), বিনয় ত্রিপিটক (অর্থ ঃ অনুশাসন পুস্তক) — এই বিশেষ গ্রন্থটি সন্ধান করাই ছিল তার যাত্রার মূল উদ্দেশ্য। এই গ্রন্থে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের নিয়ম, আচার, রচনা করা হয়েছিল। কিন্তু একটি গ্রন্থের জন্য এত বিশাল দুরত্ব যাত্রা করার কারণ কী ছিল সেটি জানার জন্য ফাহিয়েনের বাল্যকালে ফিরে যেতে হবে। তাঁর জন্মের পর তাঁর পিতা তাঁকে বৌদ্ধমঠে পাঠিয়ে দেন। মঠের শান্ত পরিবেশ তাঁর এত প্রিয় হয়ে গেছিল যে, সেখান থেকে তাঁর পরিবারবর্গরা তাকে নিজগৃহে নিয়ে আসতে গেলেন। তখন তিনি সেই প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন। এরপর দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর তিনি বিভিন্ন, ধর্মগ্রন্থ, পুস্তক, শিলালিপি অধ্যয়ন করতে লাগলেন। এসময় বিনয় ত্রিপিটক পুস্তকটি তিনি খারাপ অবস্থায় পেয়েছিলেন। ফলত তিনি হতাশ হলেন। তাই এই পুস্তক সন্ধান করার জন্য বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের সঙ্গে নিয়ে ভগবান বৌদ্ধের জন্মভূমি তৎকালীন ভারতে এক নতুন সফরে বেরিয়ে পড়লেন।

দীর্ঘ দেড় বছর তাঁরা পদব্রজে যাত্রা করেন, তাঁরা প্রথমে চিন থেকে কাসগড় পরে খোতান ও এরপর তাঁরা উত্তর ভারতে পৌঁছান। এই সুদীর্ঘ যাত্রাপথে তাঁদের অনেক প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। সবথেকে সমস্যা করেছিল 'হিমালয় পর্বত' পায়ে হেঁটে চলাচল করা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। ফা-হিয়েনের কাছে তার সৎ উদ্দেশ্য ছাড়া আর কিছু ছিল না। প্রবল তুষারপাত ও হাঁড় কাপানো ঠাণ্ডা তাঁর অদম্য ইচ্ছাকে ক্ষান্ত করেনি। যাত্রাপথে তাঁর এক সঙ্গী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুর পূর্বে সেই ব্যক্তি তাঁকে ভারতে যেতে সাবধান করেন। তাঁর মনে সংকোচ তৈরি হয়। তিনি তাঁর সংকল্পে অটল থাকবেন নাকি আবার চিনে প্রত্যাগমন করবেন! কিন্তু ফা-হিয়েনের উদ্দেশ্য ছিল সততায় পরিপূর্ণ, তাঁর সংকল্প থেকে তিনি এক ইঞ্চি সরলেন না এবং যথাযথ সাফল্যর সাথে ভারতে তাঁর গন্তব্যস্থলে পৌঁছালেন।

দীর্ঘ যাত্রাপথে তিনি যখন মথুরা আসলেন তখন তাঁর বয়স ৬৭ বছর। তিনি তার বইতে এই স্থানকে 'মাও-টা-লু' বলে উল্লেখ করেছেন। যার অর্থ 'ময়ূরের শহর'। এখানে বেশ কিছু কাল অবস্থানরত ছিলেন এবং তাঁর উদ্দেশ্য সফল করার কর্মে লিপ্ত হলেন। তিনি এখানে স্থানীয় বৌদ্ধ মঠে পুস্তকটি অনুসন্ধান করতে লাগলেন। কিন্তু সফল হলেন না। এরপর তিনি পাটলিপুত্র আসেন যা ছিল তৎকালীন ভারবর্ষের উল্লেখযোগ্য শহর, এখানে তিনি সম্রাট অশোকের রাজপ্রাসাদ দেখে মন্তব্য করেন। ''এটি দেখে মনে হয় যেন এর নির্মাণকার্য মানুষ নয় দেবতার দ্বারা সম্পাদন হয়েছে''। এখনও ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায় এই শহরের।

ফা-হিয়েন এবার আসল সৎ উদ্দেশ্যের খোঁজ পেলেন। পাটলিপুত্রের এক মহাযান বৌদ্ধমঠে বিনয় ত্রিপিটক পুস্তকটির সন্ধান পান। তিনি বেশ আপ্লুত হন। কিন্তু তিনি কিছুটা বিষাদগ্রস্ত হয়ে গেলেন যে, পুস্তকটি সংস্কৃত ভাষায় রচনা করা আছে, আর তিনি সংস্কৃত ভাষা জানতেন না। এরপর দীর্ঘ তিন বছর পাটলিপুত্র থেকে সংস্কৃত ভাষায় অধ্যয়ন করেন, ৭০ বছর বয়সে এক নতুন ভাষা শেখা খুবই প্রশংসনীয়। তাঁর দীর্ঘ ১৫ বছর যাত্রাকালে। ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে ৭ বছর, মধ্য ভারতে ৫ বছর গ্রন্থ অনুসন্ধান করেন। এবং যাত্রার অন্তিমপর্বে বিনয় ত্রিপিটকের নিয়ম, আচার সংস্কৃত ভাষা থেকে চিনা ভাষায় অনুবাদ করার কার্যে লিপ্ত হন। স্বদেশ প্রত্যাবর্তন সময় তিনি তৎকালীন বাংলার তাম্রলিপ্তে আসেন। সেই সময় এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বন্দর ছিল। এখানে থেকে শ্রীলঙ্কা হয়ে নিজ জন্মভূমি চিনে চলে যান। তাঁর যাত্রা সফল হয়, তখন তাঁর বয়স ৭২ বছর। এই ঐতিহাসিক যাত্রা পরবর্তীকালে, চিনা যাত্রী হিয়েন সাঙ ও আই সিয়েজকে অনুপ্রাণিত করেন।

WETLAND : The Nature's Kidney

Bidisha Das
4th Semester, B.Sc, Botany (Hons.)

A Wetland is a place in which the land is covered by water-salt, fresh. On some where in between either sea sonally or permanently.

According to Ramsar convention (1971), Wetlands are difined as areas of marshes, ferns Peatlands or water, wheither natural or artificial, permanent or temporary with water.

India has over 27000 Wetlands of which over 23000 are inland Wetlands while around 4000 are coastal Wetlands.

The world's largest Wetlands include the Amazon River basin, the west siberian plain, the Pantanal in south south America and the Sundarbans in the Ganges Brahmaputra delta.

Its function as natural sponges that trap and slowly release surface water rain, Snow mett and flood waters. Wetlands within and downstream of urban areas are particularly valuable, counteracting the greatly increased rate and vloume of surface water runoff from pavement and buildings.

Preserving and restoring Wetlands together with other water retention can often previded by expensive dredge operations and leves.

Indeed, an international importance was developed because some species of migratory binds are completly dependent on certain wetlands and would become extinct if those Wetlands are destroyed.

Protecting Wetlands can protect our safety and welfare. It plays an integral role in the ecology of watershed.

How Concept of Cone is used for Ordering of Elements in Real Linear Spaces

Dr. Koushik Das
Assistant Professor, Department of Mathematics

We know that the set of all real numbers R is totally ordered, i.e. every two real numbers are comparable: either $x \le y$ or $y \le x$, for any two real numbers x and y. But R^2 (Cartesian product R x R) is not totally ordered; for example we cannot compare (1, 2) and (2, 1), where $\le$ is defined by $(x_1, y_1) \le (x_2, y_2)$ if and only if $x_1 \le x_2$ and $y_1 \le y_2$. So R^2 is a partially ordered linear space. Now we can say that $(x_1, y_1) \le (x_2, y_2)$ if and only if $(x_2 - x_1, y_2 - y_1)$ is an element of the first quadrant of R^2. We denote the first quadrant of R^2 by R^2_+ . In Geometry, we all are familiar with the concept of cones. With our basic knowledge, we can say that it is a cone. Now we try to understand how the concept of a cone is used for ordering of elements in real linear spaces.

Let C be a nonempty subset of a real linear space X. The set C is called a cone, if $x \in C, \lambda \ge 0 \Rightarrow \lambda x \in C$. By definition each cone contains the zero element of the real linear space. If $x \in C$, the set $\{\lambda x : \lambda \ge 0\}$ is basically a ray emanating from the origin through the point x. So from a geometric point of view, a nontrivial cone is a set of rays emanating from the origin.

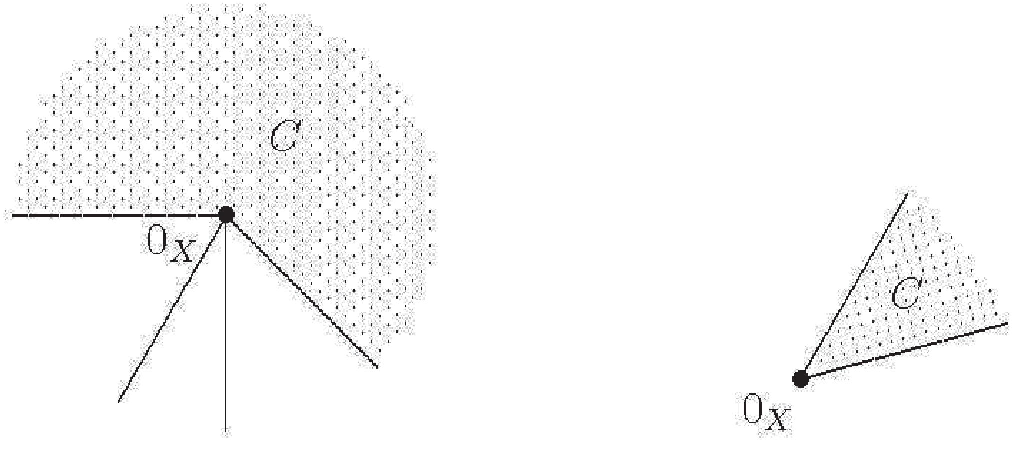

Examples of Cones

A cone C is called pointed, if $C \cap (-C) = \{0_X\}$. A cone C in a real linear space is convex if and only if $C + C \subset C$. In addition to the linear structure of a space, we consider a partial ordering

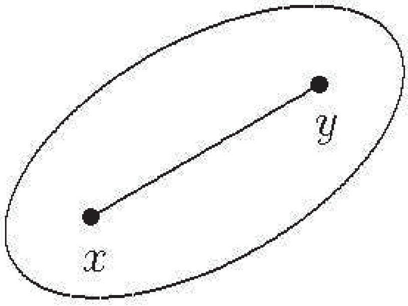

Convex Set

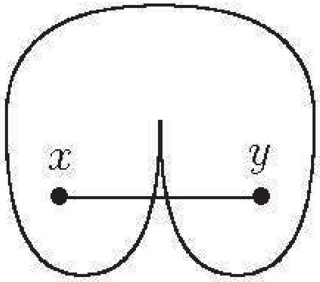

Nonconvex set

which is given in many real linear spaces being of practical interest. A real linear space equipped with a partial ordering is called a partially ordered linear space.

It is important to note that in a partially ordered linear space two arbitrary elements cannot be compared, in general, in terms of the partial ordering. If $\leq$ is a partial ordering on X, then the set $C := \{x \in X : 0_X \leq X\}$ is a convex cone. If, in addition, $\leq$ is antisymmetric, then C is pointed. Conversely, If C is a convex cone in X, then the binary relation $\leq_C := \{(x, y) \in X \times X : y - x \in C\}$ is a partial ordering on X. If, in addition, C is pointed, then $\leq_C$ is antisymmetric. This theorem is easy to prove and is of great importance because a partial ordering can be investigated using convex analysis. A convex cone characterizing a partial ordering in a real linear space is called an ordering cone. For $X = R^n$, the ordering cone of the componentwise partial ordering on R^n is given by $C := \{x \in R^n : x_i \geq 0 \text{ for all } i \in \{1, \ldots, n\}\}$. It is also called the natural ordering cone. Other ordering cones in R^n are for instance $\{x \in R^n : x_i \geq 0 \text{ for all } i \in \{1, \ldots, m\} \text{ and } x_i = 0 \text{ for all } i \in \{m + 1, \ldots, n\}\}$ for some m, with $1 \leq m < n$, or {}, and R^n itself. R_+, R_-, {0}, and R are the only ordering cones in R.

Secret Sharing: The Mathematics Behind It

Dr. Jyotirmoy Pramanik
Assistant Professor, Department of Mathematics

We all have secrets. And we wish to hide them properly. The best way, probably, is to shove it down your heart and seal your lips. The Secret dies with you. But what if the secret deserved better? What if you are nothing but a career of the (secret) message and in order for it to be secure enough, you give up its longevity. So, maybe you would want to store the secret at multiple locations with multiple people, but that would invoke the 'trust' question only! How does one trust a person? Totally? The answer is simple. One can never be sure of it! The world is full of deceits and so are we. Then, can we protect a secret at all?

Here is an idea. Instead of multiplying the secret, you divide it! For example, you may remember how goons in old Hindi movies used to split a one rupee note into two parts for identification and when they had to do business with each other, they would check if the two pieces match or not. The problem of sharing (storing, in some sense) a secret, secretly, has however been addressed by mathematicians and computer scientists, and they have produced not one but numerous cool ways to do it. What I describe here, is the first technique devised by a Turing award winning scientist Adi Shamir back in 1979.

Before we start learning how to do it, a brief mathematical groundwork needs to be done. Let us denote the set of numbers {0, 1, ... , p-1} ,i.e. 0 through p-1, by Z_p, where p is a prime number, i.e. a positive whole number having only two positive factors namely 1 and itself. So, for example, 5 is a prime and Z_5 = {0,1,2,3,4}. Now, for any two numbers in this set Z_P, we define addition by adding them up in the natural sense, except for the case where the sum equals or exceeds p. In such a case, we divide the sum by p and consider the remainder as the sum value. With this slight modification of the usual addition, our purpose of sharing a secret, shall be served. Let me exemplify. If you consider the prime to be 5 (as before), the following sums are usual in Z_5: 2 + 2 = 4, 1 + 3 = 4, 1 + 0 = 1 etc. but 3 + 4, instead of being 7, is 2, since 7 would exceed 5 and hence, we divide it by 5 and consider the remainder 2 as the sum value. The reader may verify the following: 4 + 4 = 3, 1 + 4 = 0 etc.

Now that we have set the groundwork up we shall be proceeding with the scheme. First we have to express our secret 's' as an element of the set Z_P = {0, 1, ... , p-1}. This is easy as we can always find a suitable prime p for which we will be able to do this as we have an infinite collection of prime numbers. In particular, using any prime number larger than s will work. So s is now, that the prime has been chosen and fixed for the time being, one of the numbers 0, 1, ... ,

p-1. Now suppose we wish to share our secret among n (say 10) designated persons in a way that at least k (say 8) of them should form a coalition to recover the secret. This means that if 7 or fewer of these designated persons wish to recover the secret they won't be able to. Mathematically speaking, the probability of an unauthorized (7 or less in number) subcollection of participants to recover the secret is equal to that of a random person (like the driver who drove the last taxi that you took) on earth! And this guarantees the security of your secret (isn't it?). In other words, even if a person has a share of the secret, he needs to find enough people (7 more) with shares of the same secret, to find out what the secret is.

Now, to generate the shares for the n (10 in this case) participants, we need to choose a k-1 degree polynomial of the form $q(x) = s + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_{k-1}x^{k-1}$ (in our case, a polynomial like $q(x) = s + 2x + x^2 + \dots + 3x^6 + 4x^7$) where s is the secret and $a_1, \dots, a_{k-1}$ are random elements of Zp, possibly with repetitions. The first participant (designated person) is given the share q(1), i.e. the value found by replacing x by 1 in the expression of q(x) and if value equals or exceeds p, it, again is divided by p and the remainder is handed over to the first participant. The second participant is handed over q(2) (the remainder after division by p, of course, if q(2) equals or exceeds p) and so on. This way to share a secret is called (*k*,*n*) threshold secret sharing. For the secret to be recovered, one has to find out (back-calculate) q(x) correctly which would be impossible without at least k (8) shares of the secret. This threshold k is to be so set up that it guarantees the security of our real life scenario. For instance, if you doubt three of the participants to cheat then set the threshold to be more than 3, say 8, so at least 8 participants should come together to reconstruct the secret!

So far we have learnt how to generate the shares for participants to take part in a secret sharing scheme. For them to reconstruct the secret in the moment of need, they use Lagrange's interpolation, a method to reconstruct a k-1 degree polynomial from any k of the evaluations of the polynomial from the n points 1,2, ... , n. As soon as the polynomial is reconstructed, one finds back the secret which happens to be the constant term of the polynomial just reconstructed. The method described here is perfectly secure. It can always hold onto an information as long as the reconstruction is not invoked. Isn't it beautiful? However, this kind of scheme is not secure if the cheating participants submit incorrect shares while reconstruction. If that be the case the scheme presented here does not assure us of reconstructing the correct secret. Against these kinds of cheaters, cheater identifiable schemes have been invented and implemented by cryptographers. For the time being, I, however, would not describe such schemes. Interested readers may google 'cheater identifiable secret sharing' and have fun! Good day.

Basic Changes In Education To Change The Nation

Pritam Mondal
Graduate, Dept. of Mathematics (2022)

"Education is the backbone of a nation". But only backbone does not define a good human structure. It needs more bones and muscles. And when the backbone is weak itself, it's too difficult to construct a structure. As a developing nation, our backbone is not sufficiently strong.

According to estimation around 20-25% children of age group between 5 to 19 have never crossed the threshold of school. In spite of the implementation of Sarva Shiksha Abhiyan in 2001, there is still 3.8% of children who work as child labour across the country. Those children have become an extra source of earning for their parents, most of whom are unaware of child protection acts and laws. According to ILO (International Labour Organization) there are around 12.9 million children in India engaged in work between the ages of 7-17 years old. Even many of them are involved in hazardous works. Such children are less likely to attend school or attend only intermittently, thereby trapping themselves in the cycle of poverty. Not only the child labours, there are lots of children in rural and slum areas who are malnourished or don't have the financial support of good health and education. An index in 2019 says India ranks 113 among 176 countries on the wellbeing of children.

Transparently it says that they need to be in special focus. More NGOs should come forward to pull the child labours out of exploitation and send them to schools, providing them with healthy foods, wearings. Some initiatives from the Education Ministry like, providing uniforms, bags, books, notebooks, mid-day meals from primary to upper primary students could have been given some support to address the issue. But faults in execution deprive the students from getting the sanctions sufficiently. So, not only the allocation of money, the Education Ministry needs to look after the execution of schemes strictly. Government should ensure free health facilities (like health camps at school premises) following a routine. Govt. also needs more stringent laws and effective implementation of it to curb the child-labour. Public and students have a great role to play in this game. Yes, all the parents are not educated enough to understand the terrible effect of child-labour on their children, but we can make them aware about it. Other students may go to the victim's parents, enlighten them; if possible they can provide free tuition for poor children. If you are not from a wealthy school, you can hardly recall the games you played in tiffin or game periods(I'm not certainly talking about hide and seek). Most of the children are much more interested in games or sports than a 50 minutes long class. Schools should introduce various indoor-outdoor games and allot at least 4-5 PT/game periods in a week to make the students regular to school.

We are about to surpass the record of 1st largest population to highest populated country. So, it's quite reasonable that the nation contains a large number of labour force. Hence any company can get sufficient labours at low cost which might attract Foreign Direct Investors to set up their own companies in India. Consequently, it would generate more employment and our economy would get boosted. But, the lack of skills in the labour force is one reason that discourages Foreign Investors to do so. If you have completed your 10th from a rural school, can you remember the last time your school participated in a science exhibition? Even I can loudly say that those schools hardly arrange extracurricular activities for their students. Since 60%(around) of our population lives in rural areas, it's not difficult to deduce the percentage of students deprived from these activities.

Schools, mainly under state boards, need to put special focus on skill enhancement activities and programmes. Teachers should encourage and help the students to take part in those programmes. Moreover there is a need for a vocational teacher in schools to look after these activities for better execution. Government's NEP is likely to address the issue. Schools should arrange educational tours for students. It will help them to get out of book knowledge as well as make them feel comfortable with different kinds of people enhancing their communication skills.

Recently, Neeraj Chopra has said "We can't be satisfied with one Gold". But the reality is "Dreaming of a billion dollars lying on bed is worthless". I'm not gonna compare India and China regarding the sports infrastructure. But being a student from a rural school, I can clearly remember that we had one PT period per week and often that too used to be substituted by Maths class to complete the unfinished chapter. We used to practice sports a few weeks prior to our Annual Sports day, just to stand on the podium. Competition was less, consequently productivity and skills of sports were low among the students. This common story is revolving across many Indian Govt. Schools. To motivate children, parents show the dedication and consistency of Sachin Tendulkar, but always want their child to be a doctor or engineer or a teacher.

Sports and games indirectly play a vital role in developing the sense of unity, discipline, acceptance of defeat, patience, good physical and mental health. And all the parents need to understand it. It's really needed to define a sports quota in every school where students of that quota can focus more on their respective game or sport, get good health and training facilities under the execution of Sports Ministry. But that's not all. What about the future of these students if they can't be able to make their place in national or internationals? So, not only the Railways, Govt. need to assure more job vacancies in other departments for sports quota. And most importantly, students need to push themselves from PUBG Battle Ground to real ground.

Published in E-Magazine

Being a developing country, India is moving fast towards digitalization. "A coin has both sides ". Whether to get the maximum benefits of digitalization or to flow with the modern time, most parents have smart phones or laptops and children are misusing it, stifling their productivity and harming mentality.

It is obvious that there is no better alternative of digitalization; but we must find ways to address the issue. Wikipedia, Google, YouTube etc. are extraordinary sources of knowledge. Teachers should assign projects or assignments to the students where they must use digital sources. It's better if they post their activities on social media which may motivate them to do more. Teachers need to cooperate with them as well as check the activities regularly. And children may develop a better hand to use the digital devices this way. So, definitely we need digitalization in education, but up to the limit so that it doesn't affect the productivity of students.

Nowadays, education is a profitable business for the non-govt institutions. And the main customer of this business is middle class parents. They are so anxious about their child's future that they are investing a thick part of their savings in this foolish game without any hesitation. They are being provoked by society. One reason is also the bad infrastructure, inadequate education quality, and less facilities in Govt. schools. Countries like Norway, UK, US, Israel expend 7-8% of their GDP in education whereas India spends around 3.5% of its GDP. State and central governments need conjoint collaboration to tackle all the issues. In this field, Delhi government's initiative has received country wide acclamation. In Delhi, even wealthy parents show interest in sending their children to the government schools.

Education has a pervasive impact on every aspect of life or to build a great nation. A country's economy becomes more productive as the proportion of educated workers increases since educated workers can more efficiently carry out tasks that require literacy and critical thinking. In this sense, education is an investment in human capital, similar to an investment in better equipment.

Published in E-Magazine

Theory of Everything?

Soumyajit Mondal
Graduate, Dept. of Mathematics (2021)

Birth of *String Theory*

The *General Theory of Relativity* is needed to understand the use of planets, stars, galaxies, and their relationship to gravity. We use *Quantum Field Theory* to understand the size and interaction of matter at the atomic and subatomic levels. These two theories work perfectly in their own domains. Now the question is why two theories to understand this universe? Can't there be one theory that enables us to understand everything that happens in the universe? From this question arose a new theory of physics, called *String Theory*.

Speciality of String Theory

The peculiarity of this theory is that it speaks of *multiple dimensions* and *quantum gravity* and what was before the *big bang*. Answer that question. There are four types of interactions in the universe. Among these, *Gravitational Force* is a force which we can't define at microscopic level. If there is a theory that can prove quantum gravity, then we get a unified theory through which we can explain all kinds of forces. Among all the theories discovered in Physics so far *String Theory* is a theory that claims to prove quantum gravity.

Concept of String Theory

We know that the nucleus of a particle contains neutrons and protons, and the electrons are always orbiting the nucleus. Protons are made of a type of particle called *Quartz*. This is the end of physics. So we have accepted that quartz is the smallest part of matter. But according to String Theory, there is a kind of energy inside quartz that is always vibrating which makes it look like a string or a membrane. This string is made of different materials for different sizes. If we had the most powerful microscope, we would see only strings around us, vibrating at different frequencies and patterns. This is why our world is so diverse. This means we have got a unified theory. But when we look at the mathematical equation of string theory, we understand that string theory is not defined in special three space dimensions and a time dimension. String theory is defined in a universe with ten space dimensions and a time dimension. That is why string theory will not work in our universe. But we can derive the *Standard Model* through this, which means that string theory can be true. So now the question arises where are the remaining six dimensions? Why can't we see them if they really are in this universe? If we look at a wire from a distance it will look one dimensional but for an ant, it is not one dimensional

because the ant can move easily on it. This means that we have some dimensions in front of us but we can't see them.

What's *Graviton?*

At the beginning of the invention of string theory, it was mathematically proved that there is a kind of massless particle in an atom. Since there is no experimental proof of string theory, scientists did not want to take it seriously. But when scientist Sir Quartz removed the complexity of this theory, he said that this particle actually describes gravity. This massless particle is called *Graviton*. These Gravitons carry gravity at the quantum level. So, if this theory is true, then we can understand all the fundamental forces at the quantum level. But still now Graviton is a hypothetical particle. Physically no such particle has yet been found.

M-Theory

String theory is very interesting. There are different forms of string theory. Different physicists have developed six different string theories based on their thinking. But the basic idea of each string theory is the same. Out of these six theories, five theories speak of ten space dimensions, but the sixth one, *Bosonic String Theory*, speaks of twenty six space dimensions. Because the framework of these six theories is the same, they are collectively called *M-Theory*.

Existence of String Theory

Finally the question arises whether string theory is right or wrong? At the moment we can't accept this theory as correct but it can't be said that it is wrong. String theory predicts a particle called *Tachyon* whose speed is greater than that of light. But in physics, the speed of light is said to be the highest, so most physicists don't accept this theory. But if somehow the existence of the Graviton particle is proved then this theory will be proved true.

Bioluminescence

Purabi Sarkar
BSC. PASSED OUT BATCH 2021

Have you ever seen a shining sea ?

Have you ever seen the films Avatar and Life of Pi ? Have you ever thought about the magic of nature shown in the above films ? Is it just animation ?

Let us look at the science behind the magic and this magic in terms of science is known as **Bioluminescence**

Bioluminescence

"The sea was luminous in specks and in the wake of the vessel, of a uniform slightly milky colour. When the water was put into a bottle, it gave out sparks..."

- Charles Darwin's first entry in zoology notebook

Bioluminescence is the emission of light due to some chemical reactions in the bodies of the living organism. Bioluminescence occurs widely in marine vertebrates and Invertebrates, as well as in some Fungi microorganisms including some bioluminescent bacteria and terrestrial arthropods such as fireflies. It is enzyme catalyzed chemiluminescence. It is the chemiluminiscence taking place in the body of the living organism and is different from fluorescence, phosphorescence. Bioluminescence is not the same thing as fluorescence, however. Florescence does not involve a chemical reaction. In fluorescence, a stimulating light is absorbed and reemitted. The fluorescing light is only visible in the presence of the stimulating light. The ink used in highlighter pens is fluorescent. Phosphorescence is similar to florescence, except the phosphorescent light is able to re-emit light for much longer periods of time. Glow in the dark stickers are phosphorescent.

Another term i.e biofluorescence which is similar to bioluminescence (production or emission of light). Though it is similar , many factors makes them different from each other.

> ***Bioluminescence is chemical reaction taking place in the living organism like fireflies whereas Biofluoroscence is the phenomenon where organisms absorbs light of shorter wavelength and emit light of longer wavelength like coral and jellyfish.***

CHEMISTRY BEHIND BIOLUMINESCENCE

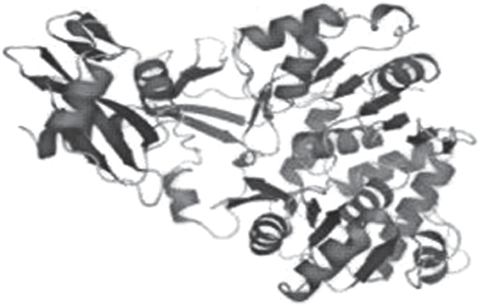

Protein structure of luciferase of firefly

All the bioluminescence reactions involve oxygen oxidation of the luciferin which is catalyzed by the enzyme called a luciferase or a photoproteins, which is a luciferase variation which factors required for light emission (including the luciferins and the oxygen) are bound together as one unit.

Photo proteins are triggered to produce light upon binding another ions or cofactor, such as Ca2+or Mg2+which causes the conformational changes in the protein. Photo proteins were only recently identified, and biologists and chemists are still studying their unusual chemical properties. Photo proteins were first studied in bioluminescent crystal jellies Aequorea victoria found off the west coast of North America.

Some bioluminescent organisms produce (synthesize) luciferin on their own. Whereas some do not produce their own but absorbs it from other organisms, either as a food or a symbiotic relationship.

More importantly , the chemical reaction creates light and bioluminescence is the cold light that means less than 20% of light generates thermal radiation or heat.

Chemical reaction:

$$\textbf{(A)}\ \text{luciferin} + O_2 \xrightarrow{\text{luciferase}} \text{oxyluciferin} + CO_2 + h\nu$$

$$\textbf{(B)}\ \text{photoprotein} + Ca^{2+} \rightarrow \text{protein-coelenteramide} + CO_2 + h\nu$$

In some cases, the bioluminescence intensity is assumed to be reflect the velocity of the enzyme substrate reaction, this intensity is used to analyze the kinetics on the Michaels Menten model.

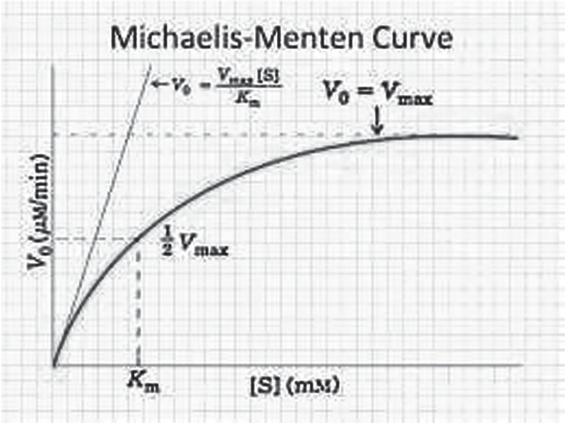

Bioluminescent species	Luciferin	Oxyluciferin
Dinoflagellates	Dinoflagellates luciferin $C_{33} H_{38} O_6 N_4 Na_2$ 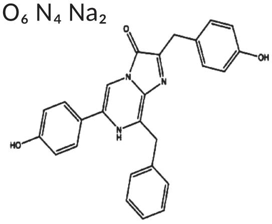	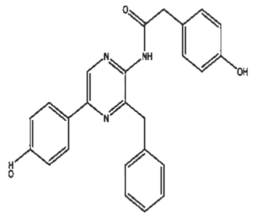
Squid, some fish	Coelenterazine $C_{26} H_{21} O_3 N_3$ 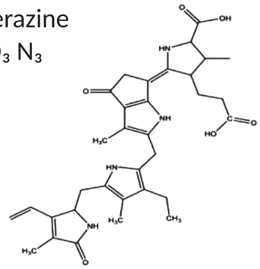	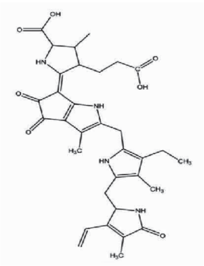
Fireflies	Firefly luciferin $C_{11} H_8 N_2 O_3 S_2$ 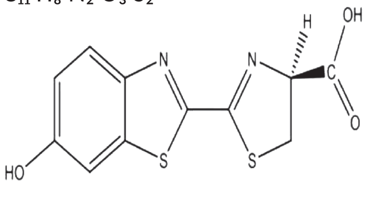	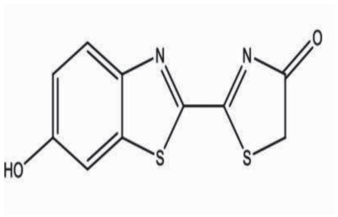

BIOLUMINESCENCE LIGHT

Bioluminescence results from a chemical reaction that releases a large amount of energy which, instead of being dissipated as heat as in a normal chemical reaction, is channeled to populate the product molecule in its excited electronic state. This excited state is the same one produced in that molecule by the absorption of radiation, so that the spectral distribution of the bioluminescence is often the same as that of the product fluorescence. The color of the bioluminescence however, is sometimes "tuned" by the protein environment of the product excited state, a property evolved to suit the function of the light emission, that is for communication, defense against predation, etc.

Visible radiation corresponds to light in the wavelength range of 400-700 nm (Figure I). Bioluminescence spectra are broad bands with widths at halfheight around 60-100 nm.

The appearance of bioluminescent light varies greatly, depending on the habitat and organism in which it is found. The bioluminescence maximum of most marine species falls within the range of 450-510 nm (7), whereas terrestrial organisms have predominantly a yellow-green bioluminescence color. In ocean water, blue to green (400-500 nm) luminescence achieves maximum transmission, whereas terrestrial species have their maximum visual sensitivity for yellow light. Visual pigments of most marine organisms are correspondingly most sensitive in the bluegreen region.

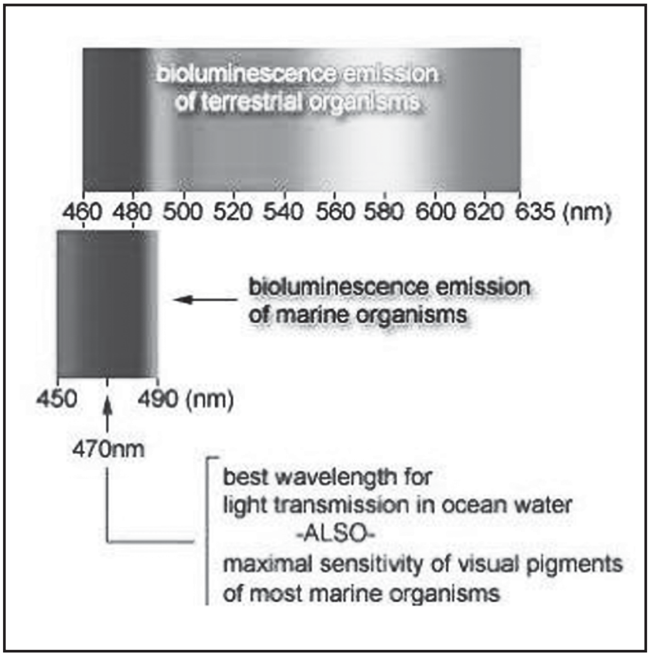

Figure I : *The end- product of bioluminescence is visible light. The visible part of the spectrum is 400-700 nm, and the emission maxima of most luminous marine organisms falls within the range of 450- 490 nm. (Source – Google)*

Published in E-Magazine

Green Fluorescent Protein (GFP)

GFP is a protein found in jellyfish that gives green colour. The protein has 238 amino acids , three of them (number 65 to 67) form a structure that emits visible green fluorescent light. GFP interacts with the photoprotein aequorin, which emits blue colour (bioluminescence) when added with calcium. GFP absorbs the blue light produced by the initial reaction and re- emit it at a longer wavelength as green light which is known as resonant energy transfer.

It act as a marker gene which is inserted in the interested gene which producing protein. It helps the Scientist to see the particular protein.

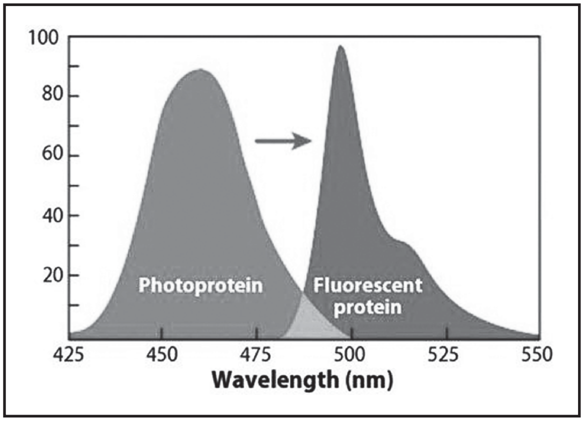

Do you know?

GFP glows green under blue or UV light and easy to detect. This work was considered so important that it was awarded the Noble prize for chemistry in 2008.

Green Fluorescence Protein

luciferin	Luminescence maximum (nm)	Approximate colour	
Firefly luciferin	560 at pH= 7.1	Green	
	615 at Ph= 5.4	Orange	
Bacterial luciferin	490	Turquoise	
Dinoflagellate luciferin	474	Blue	
Coelenterazine	*450-480 as an anion*	Blue to turquoise	
	400 in the -COOH form	*Purple*	

FUNCTION OF BIOLUMINESCENCE

Defense
Schooling of fish
Luminous lure

Feeding
Communication
Meeting
Camouflage

BIOLUMINESCENCE AND PEOPLE

This bioluminescence has a wide application. Once the scientist discovered that the fireflies create luciferase and luciferin. So they use genetic engineering to make this light creating reaction in other organism so that can glow.

They insert gene creating luciferase and luciferin in the tobacco plant. Due to this reaction it is able to lights up. They are trying to create this reaction in trees as there are many practical use of this. By this way it will be possible to create energy free and environment friendly safe lights which can be planted at the side of the roads. Another important use of bioluminescene is that the bioluminescence bacretia is use to detect the pollutant In water.

Biolights

The new "bio-light "concept of Dutch electronics company Philips creates light in the same way as the bioluminescent living organism like fireflies and glow worm do. Philips newest Microbial Home project is resourceful and present which depend on the biological process. The system uses bioluminescent bacteria which feed on the methane and composed material which produces soft green lights. The bacteria is housed in the wall of hand blown glass cells and connected to the food source at the base through thin silicon tubes. The bacteria's food source comes in the form of methane gas which comes from the solid bathroom waste and vegetable trimming using the methane digesters located in Philips biodigester kitchen island – the main hub of the Microbial Home.

Light produced by bacteria is heat free compared to incandescence which is light generated by objects heated to glowing.

Philips Biolights

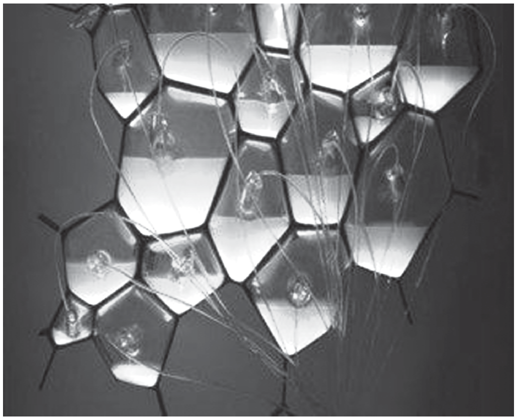

Microbial Home Project of Philips

Bioluminescence Imaging

Bioluminescence imaging is a technique that takes the advantage of the light emission by the organisms which involves luciferin and luciferase. It is used to detect the tumor growth and for the detection of cancers like A549 lung cancer and MDA-MB 231 breast cancer. It is particularly well suited for the small animals.

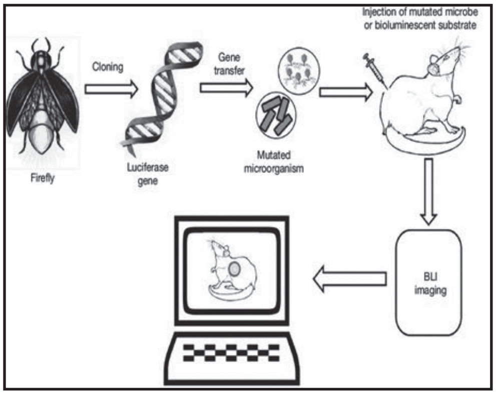

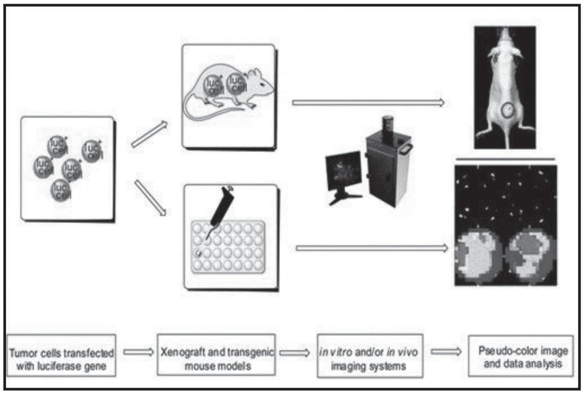

HUMAN BIOLUMINESCENCE .... WE ARE GLOWING

Human body glimmers, emitting very low intensity light which is not detected by the human eyes. This discoveries was made by the Japnease researchers Daisuke Kikuchi and Masaki Koboyashi from the tohoko institude of technology and were able to take the first image of the human bioluminescence. This was published in the PLoS One, in the paper titled, "Imaging of Ultraweak Spontaneous Photon Emission from Human Body Displaying Diurnal Rhythm.

As the light is not dectected by the human eyes so highly sensitive CCD (Charged coupled device) camera. This discovery is high achievement in the field of biology.

Researchers stated that "the human body directly and rhythmically emits light" and that there is the diurnal change in photo emission.

Experimenting Bioluminescence in Humans

Researchers Daisuke Kikuchi and Masaki Kobayashi used a very sensitive CCD camera to observe the upper bodies of the volunteers over a period of days

Five male volunteers stripped down, cleaned their skin, and entered a light sealed chamber for 20 minutes every 30 hours between 10am to 10pm. The researchers used a special ultra sensitive CCD camera kept at -120°C that can detect individual photons.

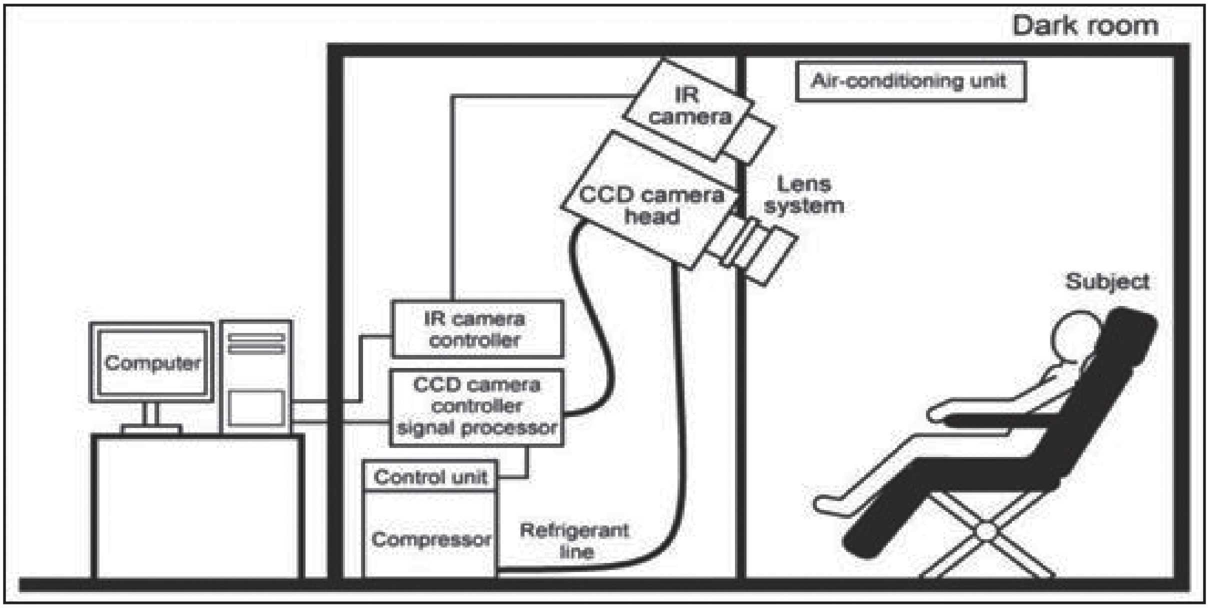

Observation

1. *The human body emits light which is invisible to the naked eye; this light is precisely 1000 times weaker than the human eye can perceive.*
2. *The human body emits light rhythmically and directly.*
3. *The light emitted by the human body is at its highest intensity late in the afternoon and it is at its lowest intensity late at night.*
4. *The forehead, cheeks and neck are the areas of the human body from which light of the brightest intensity is emitted as compared to other body parts.*
5. *It was also noted that the brightest areas noticed upon thermal imaging of the human body did not correspond with the brightest areas on these images of human bioluminescence.*

***Reason behind this Bioluminescence Bioluminescence** in humans occurs due to metabolic reactions. When cells of the human body respire they produce highly reactive free radicals. These free radicals interact with free floating protein and lipids. This reaction can, at times, lead to further interaction with fluoro phores in the human body, which leads to the emission of light.*

BIBLIOGRAPHY

Photos source:

http://petapixel.com
www.researchgate.net
www.scienceinschool.org
www.canon.co.nz http://
amp.cnn.com http://
en.m.wikipedia.org http://
photobiology.info http://
www.telegraph.co.uk http://
tuitiontube.com http://
pubs,rsc.org

Video :

The chemistry of Bioluminescence
Matthew Elias

Wikipedia.com

* Bioluminescence
* Bioluminescence

imaging Sciencedaily.
com Embryo.asu.edu
Scienceschool.org

Cnet.co.nz
Research
gate

* Bioluminescence
* Bioluminescence

imaging Photobiology

Bitesis.org
Britanicca.com
National geograsphy.
org Nature.com

Petapixel.com

www.bbntimes-com.cdn.ampproject.org

টাকি কলেজের সোনালী দিন

সীমা গঙ্গোপাধ্যায়
প্রাক্তন ছাত্রী

টাকি আমার দুর্বলতম ভালবাসার জায়গা। সেখানকার স্কুল, কলেজ, লাইব্রেরি, প্রকৃতি ইছামতী নদী সবকিছুর সঙ্গে নাড়ীর টান। টাকি নিয়ে কিছু বলতে গেলেই স্মৃতি মেদুর হয়ে পড়ি। আজ আমি বলতে বসেছি টাকি কলেজের আমার সোনালী দিনের কথা।

আমি ৭৭ সালের মাধ্যমিকের ব্যাচ। আমাদের সময়ে এগারো-বারো ক্লাস কলেজে পড়ানো হত। মাধ্যমিক পাশের পর কলেজে ভর্তি হবো ভিতরে ভিতরে বেশ উত্তেজনা অনুভব করছি। যে কলেজের পাশ দিয়ে এতগুলো বছর যাতায়াত করেছি স্কুল যাওয়ার পথে, সেখানে প্রবেশ করার সাহস বা অধিকার কোনওটাই ছিল না। শুধু অবাক হয়ে বড় বড় দাদা দিদিদের দেখতাম। আর প্রফেসারদের দেখলে মনে হত তাঁরা আলাদা কোনও জীব জগতের বাসিন্দা। দূর থেকে যাদের সমীহ করা যায়, কাছে যাওয়া যায় না। সদ্য স্কুলের গন্ডী পেরিয়ে সেই কলেজেই একদিন দুরু দুরু বুকে পা রাখলাম।

প্রথম দু-চার দিন ক্লাস প্রায় না হওয়ার মতো। হলেও পরিচয় পর্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। রাজনীতির দাদারা পার্টি বোঝাতে আসে, প্রথম দিকে এড়িয়ে যাই। পরে অনেক তর্কও করেছি তাদের সঙ্গে। কিন্তু সে তর্ক কখনও তিক্ততায় পৌঁছায় নি। সে এস.এফ.আই বা ছাত্র পরিষদ যেই হোক। বরং ছোটবোনের মতো প্রশ্রয় পেয়েছি বা তারা ছাড় দিয়েছে। এমন সুসম্পর্কের মধ্যে আমরা কলেজ জীবন অতিবাহিত করেছি।

এগারো ক্লাসে প্রথম বাংলা ক্লাস করি অধ্যাপক রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পোলিয়োয় আক্রান্ত পা, ক্রাচ নিয়ে চলাফেরা করতেন। নাম ডাকার পর শুরু করলেন পড়ানো। সেদিন গদ্য না পদ্য পড়িয়েছিলেন আজ আর মনে নেই। শুধু মনে আছে অবাক বিস্ময়ে ভাবছি পড়ানো এমন হতে পারে! সেই শুরু ক্লাসে পড়াশোনা। এত বছর স্কুল জীবনে কোনও দিন আমার মনে এমন পড়ানোর স্মৃতি নেই। মনে পড়ে পলিটিক্যাল সায়েন্সে প্রবোধ ধরচৌধুরী, বিভাস চক্রবর্তী, ইতিহাসে সুদীন চ্যাটার্জী, ইংরাজির নীলাদ্রিবাবু, এঁনাদের ক্লাস মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনতাম। আমি আর আমার বন্ধু শিখা তো সুদীনবাবুর ইতিহাসের যে কোনও ক্লাসে ঢুকে পড়া শুনতাম। স্যার একবার আমাদের দুজনকে অন্য ক্লাসে দেখে বলেন, ''এই ক্লাসে এমন দুজনকে দেখতে পাচ্ছি যারা শিং ভেঙে বাছুরদের দলে ঢুকেছে।'' কলেজ স্পোর্টস উনি যখন ধারাভাষ্য দিতেন সেও ছিল অতি উচ্চাঙ্গের। বিদ্যায়-বুদ্ধিতে, রূপে-গুণে স্যার আমাদের মোহিত করে রাখতেন। ইংরাজির অধ্যাপকদের মধ্যে বিশেষ করে মনে পড়ে নীলাদ্রিবাবুর কথা। অসাধারণ পড়াতেন। নীলাদ্রিবাবু আমরা কলেজে ঢোকার এক যুগ আগে টাকিতে অধ্যাপক হয়ে আসেন। আসামাত্র টাকি কলেজে ছাত্রী মহলে সাড়া পড়ে গেল এক স্বপ্নের রাজপুত্র সশরীরে হাজির হয়েছেন কলেজে। তখন আমার দিদি কলেজে পড়ে। শুনেছি রাজকন্যাদের পত্রাঘাত, নানারকম কটাক্ষ অনেকদিন তাঁকে সহ্য করতে হয়েছিল। কোনও কিছুই তাঁর ব্যক্তিত্বকে টলাতে পারেনি। তাই তাঁর আকর্ষণ শেষদিন পর্যন্ত অটুট ছিল। আমরা যখন কলেজে ঢুকি বয়স তাঁকে কিছুটা হলেও ছুঁয়েছে। আর এক ঝাঁক তরুণ অধ্যাপকের উপস্থিতিও নীলাদ্রিবাবুকে খানিকটা আড়াল করেছিল। বারো ক্লাসে ওঠার অল্প কয়েকদিনের মধ্যে অন্য কলেজে বদলি হয়ে যান।

উচ্চমাধ্যমিকে উত্তীর্ণ হয়ে এবার ভর্তির পালা বি.এ. ক্লাসে। বাংলা প্রিয় বিষয় তাই অনার্স নিলাম বাংলায়। সেখানেও পেলাম একঝাঁক প্রিয় স্যারদের। অধ্যাপক দেবদাস জোয়ারদার, মিহিরদেব বর্মণ, সঞ্জয় মজুমদার, জীবেন্দু সিংহরায় যাঁরা স্মৃতির মণিকোঠায় উজ্জ্বল হয়ে আছেন। সবচেয়ে বেশি মনে পড়ে দেবদাসবাবুর কথা। দেবদাস জোয়ারদার মানে রবীন্দ্রনাথ, বিশ্বসাহিত্য, আধুনিক কবিতা, উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ, ছন্দ-অলঙ্কার, সাহিত্যের ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব। সাহিত্যের যে কোনও বিষয়ে তাঁর ছিল অবাধ বিচরণ। ছাত্র-ছাত্রী ছিল তাঁর প্রাণ। স্যার কখনও আমাদের নোট দিতেন না। এমনভাবে পড়াতেন তার মধ্যে পেয়ে যেতাম অনেক তথ্য। সহজ হয়ে যেত নোট তৈরি করা। স্যারকে একবার আমরা বলেছিলাম, 'স্যার আমাদের প্রাইভেট পড়াবেন?' স্যরা

বলেছিলেন, ‘কেন’? তোমাদের পড়ানোয় আমি কি কোও ফাঁক রাখি? যত ইচ্ছা ক্লাস নিতে বল আমি নেব। যত নোট লিখবে আমি দেখে দেব। কিন্তু আমি টিউশনি করব না। অত টাকার আমার দরকার নেই।

দেবদাসবাবু বলতেন, ‘কলকাতার কলেজে পড়াতে পড়াতে আমি বেশ ক্লান্ত হয়ে যেতাম। টাকিতে এসে আমার বেশ ভাল লাগে। টাকীর সবুজ প্রকৃতি, ইছামতী নদী, এখানকার শান্ত পরিবেশ, আমি প্রাণ ফিরে পেয়েছি।’ অধ্যাপক জীবেন্দুবাবুও বলতেন, ‘টাকিতে যখন পোস্টিং হল, মনে হল সে গ্রামে বাঘ ভাল্লুক ঘুরে বেড়ায়। চিরকাল কলকাতার ছেলে খুব ভয় পেয়েছিলাম। ‘কিন্তু টাকিতে না আসলে আমার সজনে ফুলের ঝুরি, আমের বোলের গন্ধ, বাতাবি লেবু ফুলের গন্ধ চেনা হত না।’ বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের স্যারদের সঙ্গেই ছিল আমাদের সুসম্পর্ক। একবার পলিটিক্যাল সায়েন্সের বিভাসবাবু আমাকে বেশ লজ্জায় ফেলে দিয়েছিলেন। করিডোরে দাঁড়িয়ে আছি অনেক ছেলেমেয়ের মধ্যে। হঠাৎ দেখি বিভাসবাবুর গলা, ‘সীমা তুমি লেলিন লিখেছ। আর যেন কখনও ভুল না হয়।’ না আর কখনও ভুল হয়নি। সেদিনের লজ্জা আমাকে শুধরে দিয়েছিল।

অধ্যাপক মিহির দেব বর্মনের কথা ভুলবার নয়। কলেজের দ্বিতীয়বর্ষ। বাংলা ডিপার্টমেন্টে একজন নতুন স্যার এসেছেন। ছোটখাট চেহারার ধুতি পাঞ্জাবি পরিহিত সৌম্যদর্শন মিহির দেব বর্মন। ছাত্রী মহলে কানাঘুষো চলছে, ‘হ্যাঁরে স্যারের বিয়ে হয়েছে? দেখে তো মনে হচ্ছে না।’ ক্লাস নেওয়া শুরু হতেই সংকোচ কেটে গিয়ে মিহিরবাবুর সঙ্গে সুন্দর সম্পর্ক তৈরি হয়।

পরশুরামের ‘লম্বকর্ণ’ পড়াতে পড়াতে স্যার এত হাসতেন যে চোখ দিয়ে জল গড়াত। কী অসাধারণ যে পড়াতেন! প্রেমেন্দ্র মিত্রের ‘তেলেনাপোতা আবিষ্কার’ পড়াচ্ছেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি গল্পের নায়ককে মিহিরবাবুর মধ্যে। সতীনাথ ভাদুড়ীর ‘জাগরী’ পড়াচ্ছেন। বিলু আর স্যার একাকার হয়ে যেতেন। আমরা মিহিরবাবুকে দেখতাম না, দেখতাম ফাঁসির আসামী বিলুকে। বিলুর কষ্ট দ্বিগুন হয়ে দেখা দিত আমাদের মধ্যে।

টাকি কলেজে আমাদের সবচেয়ে সুন্দর দিন কেটেছে স্যারদের সঙ্গলাভে। অবারিত দ্বার ছিল তাঁদের কাছে যাওয়ার। ছাত্রছাত্রীদের সব আবদার মেটাতেন তাঁরা। একবার বাংলা ডিপার্টমেন্টের মেয়েরা ঠিক করি ঘোঁচডাঙা বর্ডার দেখতে যাব। দেবদাসবাবু আর মিহিরবাবুকে ধরলাম স্যার আপনাদের যেতে হবে। এক রবিবার ছুটির দিনে সবাই মিলে চললাম ঘোঁচাডাঙা বর্ডার দেখতে। গ্রামের পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে এক সময়ে পৌঁছালাম বাংলাদেশ সীমান্তের বর্ডারে। বিকেলে বসিরহাট ইছামতীতে নৌকাচড়া। সূর্যাস্তের স্নান আলোয় গান চলছে। মিহিরবাবুকে ধরলাম স্যার আপনি কিছু শোনান। স্যার আবৃত্তি করলেন —

> ‘‘দূরে বহুদূরে
>
> স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনী পুরে
>
> খুঁজিতে গেছিনু কবে শিপ্রানদী পারে
>
> মোর পূর্বজনমের প্রথমা প্রিয়ারে।’’

আর একবার কলেজের সব অনার্স ডিপার্টমেন্ট থেকে আর একবার ঠিক হল মাছরাঙ দ্বীপে পিকনিক করতে যাব। স্যাররা এক কথায় রাজি। হাসনাবাদ থেকে নৌকা ভাড়া করে রান্নার সব জিনিসপত্র, খাওয়ার জল, বাজার সব নিয়ে রওনা দিলাম মাছরাঙা দ্বীপে। সবাই খুব উত্তেজিত। দিনটা ছিল মেঘলা। মাঝে মাঝে ঝিরঝিরে বৃষ্টি। মনুষ্যবিহীন নির্জন দ্বীপে বাঁশ খড়ের তৈরি একটা চালাঘর ছিল। সেখানেই আশ্রয় নেওয়া গেল। দ্বীপের জমি মূলত বালিমাটির। অগভীর জলাশয় খুঁড়ে সেখানে মাছ চাষ চলছে। গাছ বলতে ছোট ছোট কাঁটা ঝোপঝাড়। পূর্বদিকে মুখ করে দাঁড়ালে দেখা যায় সামনে বাংলাদেশ। যেন হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যাবে।

দ্বীপের মধ্যে ঘুরতে বেরিয়ে এলোমেলো ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টি আমাদের তাড়িয়ে নিয়ে চালার নীচে। সেখানে গন্ধে, আড্ডায়, ভিজে কাঠের আগুনের ধোঁয়ায়, আধসিদ্ধ মাংস ভাত দারুণ জমেছিল। বিকাল থেকে মেঘ কেটে গিয়ে পরিষ্কার আকাশ।

বিশাল নির্জন, শান্ত দ্বীপে আমরা ক'জন। শীতের দিন বেলা ছোট। বৃষ্টিধোয়া সে বিকালের রূপ আজও আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল। ফেরার সময় দেখলাম পরিষ্কার আকাশে গোল চাঁদ। নদীর জলে চাঁদের আলো ঢেউয়ে ভেঙে ভেঙে ভেসে চলেছে। দেবদাসবাবুর মাথায় মস্ত চকচকে টাক। মিহিরবাবু স্যারের একটু পিছনে লাগলেন, দেবদাসদা চাঁদের আলো আপনার মাথায় পিছলে যাচ্ছে। নীল আর্মস্ট্রং এখন যদি চাঁদে নামতেন তাহলে ভুল করে আপনার মাথায় নেমে যেতেন। ছাত্রছাত্রীরা গানে গানে পৌঁছে গেলাম হাসনাবাদ নদীর ঘাটে। আমাদের সময়ে এমন ছিল ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক।

আমাদের সময়ে কলেজে প্রবেশ করার পথ ছিল বড় রাস্তার দিকের গেট দিয়ে। গেটের অদূরে দুপাশে ছিল দুটো বড় বড় লালচন্দন গাছ। চন্দন গাছের লাল টুকটুকে ফলে ভরে যেত রাস্তা, কলেজ চত্তর, করিডোর সর্বত্র। লাল পুঁথির মতো ফলগুলো এমনই কুড়াতাম সৌন্দর্যের জন্য। ফাল্গুন চৈত্র মাসে নতুন পাতায় ভরে যেত গাছগুলো। আমি মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকতাম নতুন পাতার চোখ ঝলসান রূপে। কলেজ ছেড়েছি প্রায় চল্লিশ বছর হতে চলল। একদিন দেখলাম গাছ দুটো নেই। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেককিছু থাকবে না, নতুন অনেককিছু তৈরি হবে সেটাই স্বাভাবিক। আমাদের সময়ে কলেজে যে সুন্দর সময় কাটিয়েছি, সেই স্মৃতিটুকুই আমার তর্পন।

একজন ইতিহাসের ছাত্রের চোখে হাজারদুয়ারি ভ্রমণ

সালাউদ্দিন সরদার
৪র্থ সেমেস্টার, বি.এ, ইতিহাস বিভাগ (অনার্স)

আমি সালাউদ্দিন সরদার (বি.এ অনার্স ইতিহাস) আমার প্রিয় বিষয় ইতিহাস এবং আমি খুব ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণ করতে ভালোবাসি। এইতো কয়েকমাস আগে ২২.১০.২০২২ তারিখ, শনিবার হাজারদুয়ারি ভ্রমণ করে এলাম। শুধুমাত্র হাজারদুয়ারি নয়, এর পার্শ্ববর্তী আরও ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণ করে এলাম। যেমন — কাটরা মসজিদ, ইমামবাড়া, জগৎ কোট এর প্রাসাদ, পলাশির ময়দান, এবং আরও অসংখ্য বিখ্যাত স্থান। ইতিহাসের শিক্ষক যখন বাংলার নবাব নিয়ে আলোচনা করতেন তখন শুনতে খুব ভালো লাগতো কিন্তু সেই ঐতিহাসিক স্থান যখন নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করলাম তখন একটা প্রশান্তি অনুভব হলো। যাইহোক আমার নিজের চোখে এবং Guide-এর বলা মূল্যবান কথাগুলি আপনাদের সাথে ভাগ করে নিতে এলাম।

আমরা ২১.১০.২০২২ শুক্রবার বাড়ি থেকে মুর্শিদাবাদের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। হাসনাবাদ থেকে সকাল ৭.৪২ লোকাল ধরলাম এবং বেলা ৯.৪০ শিয়ালদহে পৌঁছালাম। এরপর বেলা ১০.৩০ শিয়ালদহ থেকে লালগোলা এক্সপ্রেসে উঠলাম এবং ৫ ঘন্টা যাত্রা করার পর দুপুর ৩.৪৫ পীড়তলা স্টেশন-এ পৌঁছালাম। সেখান থেকে মাসির ছেলে আমাকে নিয়ে যায়। তারপর বিশ্রাম নিয়ে পরদিন অর্থাৎ ২২.১০.২০২২ শনিবার হাজারদুয়ারি ভ্রমণে গেলাম বেলা ১০ নাগাদ। সেখানে পৌঁছে ২০ টাকার টিকিট কাটলাম এবং একটি গাইডকে সাথে নিয়ে সেই বিখ্যাত হাজারদুয়ারি প্রাসাদে প্রবেশ করলাম।

হাজারদুয়ারিতে প্রবেশ করা মাত্রই গাইড আমাদের হাজারদুয়ারির ইতিহাস, মুর্শিদ কুলি খাঁ, আলিবর্দি খাঁ, সিরাজউদ্দৌল্লা, মিরজাফর, অন্যান্য বিভিন্ন বিখ্যাত ব্যক্তি বং হাজারদুয়ারি পাশ্ববর্তী বিখ্যাত স্থানগুলি সম্পর্কে অনেক কাহিনী আমাদেরকে বললেন। তা নিম্নে আলোচনা করছি — হাজারদুয়ারি প্রাসাদ ঃ হাজারদুয়ারি প্রাসাদ মুর্শিদাবাদ শহরের অন্যতম সেরা আকর্ষণ। ১৮৩৭ সালে **Nawab Nazim Humayun Jah** জন্য ৮০ ফুট ৩ তলা গম্বুজ ওয়ালা প্রাসাদটি নির্মিত হয়। এর ৯০০ দরজা হলেও আরও ১০০টি কৃত্রিম দরজা আছে। এটি এখন ভারত সরকারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

হাজারদুয়ারী প্রাসাদটির চমক শুধু এটার দরজাই না এর ঘরগুলো মনোমুগ্ধকর। এখানে মাসে প্রায় ৩০০০০ মানুষ এর দর্শনে আসেন। হাজারদুয়ারির অভ্যন্তরে কোনো ঘরে আসে অস্ত্রশস্ত্র। বৈঠকখানা। আবার কয়েকটি ঘরে আছে যুদ্ধে বিভিন্ন ভারি অস্ত্র ও সাজসজ্জা এবং অন্যান্য ঘরে আসে বিভিন্ন তৈল চিত্র আর রোমান ঢঙে তৈরি বিভিন্ন মূর্তি। হাজারদুয়ারি সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য পেলাম গাইড-এর কাছ থেকে। সেগুলি হলো —

হাজারদুয়ারি প্রাক্তন নাম ঃ বরাকোটি।

বিকল্প নাম ঃ নিজামতকোটি।

স্থাপত্য রীতি ঃ উনিশ শতকে ইতালীয় শৈলীতে নির্মিত প্রাসাদ।

এটি সম্পূর্ণ তৈরি হয় : 1837 AD, December হাজারদুয়ারি প্রাসাদটি তৈরি করতে মোট খরচ হয় ঃ ১৬.৫০ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা। এরপর গাইড ৩০ মিনিট হাজারদুয়ারি অভ্যন্তরভাগ ভ্রমণ করিয়ে বাইরে আনে। বাইরে বার হয়ে দেখতে পেলাম বৃহৎ ইমামবারা। যেটিতে শুধুমাত্র মহরণ মাঘে প্রবেশ করতে পারবে সবাই। হাজারদুয়ারির একেবার সামনে ছিল মদিনা মসজিদ। সেখানে নবাব মদিনা থেকে মাটি এনে যেখানে সঞ্চয় করে রেখেছেন। এবার হাজারদুয়ারি চত্বর থেকে বার হয়ে কাটরা মসজিদের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। যাওয়ার পথে গাইড আমাদের বাংলার বিভিন্ন নবাব সম্পর্কে আলোচনা শুরু করলেন। আমি তাদের সম্পর্কে কিছু তথ্য উল্লেখ করলাম।

Murshid Quli Khan (1660-1727) :

আমাদের এখন আলোচনার বিষয় হলো মুর্শিদ কুলি খাঁ। যিনি জমিন আলী কুলি নামেও পরিচিত এবং সূর্য নারায়ণ মিশ্র নামে জন্ম গ্রহন করেন। তিনি ছিলেন বাংলার প্রথম নবাব। যিনি ১৭১৭-১৭২৭ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। তার উপর মুঘল সাম্রাজ্যের নামমাত্র আধিপত্য ছিল। সকল উদ্দেশ্যেই তিনি বাংলার নবাব ছিলেন। জন্ম আনু ঃ ১৬৬০ দাক্ষিণাত্য মালভূমি।

স্যার যদুনাথ সরকার-এর মতে — মুর্শিদ কুলি খান মূলত একজন হিন্দু ছিলেন। আনু ঃ ১০ বছর বয়সে তাকে হাজিশফি নামে একজন পারস্যের কাছে তাকে বিক্রয় করে দেন। যিনি তাকে খতনা ও ইসলাম ধর্মে প্রবর্তিত করেন। তাকে মহম্মা হুদি নান দিয়ে তাকে বড়ো করেন। ১৬৯০ সালে শকি মুঘল দরবারে তার অবস্থান ত্যাগ করেন এবং পারস্যে ফিরে আসেন। মুর্শিদ কুলি খান তার সাথে পারস্যে যান। শফির মৃত্যুর দু বছর পর তিনি ভারতে ফিরে আসেন এবং মুঘল সাম্রাজ্যে বিদর্ভ-এর দেওয়ান আবদুল্লাহ খুরাসনির অধীনে কাজ করেন। রাজস্ব সংক্রান্ত দক্ষতার কারণে, তিনি মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের নজরে পড়েন। এবং পরবর্তীকালে ঔরঙ্গজেব তাকে বাংলার নবাব পদে নিযুক্ত করেন।

Murshid Quli Khan

Nawab Alivardi Khan (1671-1756) :

নবাব আলিবর্দী খান ১৭৪০-১৭৫৬ সাল পর্যন্ত বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব ছিলেন। তিনি দীর্ঘ ১৬ বছর বাংলার নবাব ছিলেন এবং তাঁর শাসনকালের অধিকাংশ সময় মারাঠা আক্রমণকারী ও আফগান বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যয়িত হয়। একজন অসমসাহসী এবং রণনিপুণ সেনাপতি হিসাবে তিনি পরিচিত ছিলেন এবং কর্মদক্ষ ও দূরদর্শী শাসক হিসাবে তার খ্যাতি ছিল। জন্ম ১০ মে ১৬৭১, দাক্ষিণাত্য। তাঁর তিনটি কন্যা ছিল — ঘসেটি বেগম, মুনিরা বেগম এবং আমিনা বেগম।

Alivardi Khan

আলিবর্দি খানের প্রকৃত নাম মির্জা মহম্মদ আলী। তাঁর পিতার নাম মির্জা মুহাম্মদ মাদানি। তিনি মুঘল দরবার কর্তৃক খান উপাধি পেয়েছিলেন, আলিবর্দী খানের মাতা ইরানের খোরাসানের এক তুর্কি উপজাতি থেকে এসে ছিল। তার পিতামহ ঔরঙ্গজেবের সৎ ভাই ছিলেন। ১৭০৭ খ্রিঃ ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর তার পুত্রদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। এ যুদ্ধে আজম শাহ পরাজিত ও নিহত হন। আলিবর্দি খান বাংলার প্রধান নবাব হিসাবে বিবেচিত হন। যখন তাঁর মৃত্যু আসন্য তখন তিনি কনিষ্ঠ কন্যার পুত্র সিরাজদ্দৌল্লাকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করে ১৭৫৬ সালে মৃত্যু বরণ করেন।

Siraj-UD-Doullah (1733-1757) :

সিরাজউদৌল্লার জন্ম ১৭৩৩ সালে। নবাব সিরাজ উদ-দৌল্লা বাংলার নবাব আলিবর্দি খান-এর নাতি। আলিবর্দি খানের কোন পুত্র সন্তান ছিল না। তার ছিল তিন কন্যা। তিন কন্যাকেই তিনি নিজের বড়ভাই ''হাজি আহমদ''-এর তিন পুত্র, নোয়াজিশ মোহাম্মদের সাথে বড় মেয়ে ঘসেটি বেগমের, সাইয়েদ আহম্মদের সালে মেজ মেয়ে শাহ বেগম এবং জয়েনউদ্দিন আহম্মদের সাথে ছোট মেয়ে আমিনা বেগমকে বিবাহ দেন। আমেনার দুই পুত্র ও এক কন্যা ছিল। পুত্রদের মধ্যে ছিল — মির্জা মোহাম্মদ (সিরাজউদ্দৌল্লা) এবং মির্জা মেহেদি। আলিবর্দি খান মৃত্যুর অগে সিরাজকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান।

Siraj-Ud-Doullah

সিরাজকে উত্তরাধিকারী করাই তাঁর নিজের মাসি ঘসেটি বেগম ষড়যন্ত্র করতে শুরু। শুধু যে ঘসেটি বেগম তা নয়, ইংরেজ কোম্পানি-এর সাথে সিরাজের বিরুদ্ধে ছিলেন — জগৎ শেঠ, রাজবল্লভ, রায়দুল্লভ, মিরজাফর প্রভৃতি নবাবে কাছে ব্যক্তিবর্গ। এরা বসাই কোম্পানি-এর সঙ্গে মিলিত হয়ে সিরাজকে সিংহাসন চ্যুত তথা হত্যার করার পরিকল্পনা করে। এরপর আমরা সবাই জানি। ১৭৫৭ সালে ২৩ জুন পলাশির প্রান্তরে একটি খণ্ডযুদ্ধ হয় এবং সেই যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌল্লার পরাজিত মিরজাফরের বিশ্বাসঘাতক এর জন্য এবং ১৭৫৭ সালে ২রা জুলাই মিরজাফরের পুত্র মিরনের আদেশে তাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়, এই তথ্যগুলি গাইড-এর কাছ থেকে পেলাম।

Mirzafar (1671-1765) :

মীর জাফর, যাঁর সম্পূর্ণ নাম সৈয়দ মীর জাফর আলি খান। ছিলেন ইংরেজ প্রভাবিত বাংলার একজন নবাব। তার শাসনামলে ভারতের কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠার শুরু এবং সমগ্র উপমহাদেশের ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। ভূতপূর্ব নবাব সিরাজউদ্দৌল্লা নদীয়ার পলাশির কাছে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন। মীর জাফর ছিলেন উক্ত যুদ্ধের সেনাপতি এবং প্রধান বিশ্বাসঘাতক। তার অধীনের সৈন্যবাহিনী যুদ্ধে অংশ গ্রহন না করা ও তার বাংলা বিরোধি পদক্ষেপের জন্য বাংলার শেষ নবাব সিরাজউদ্দৌল্লাকে পরাজয় বরণ করতে হয়।

Mirzafar

ইংরেজদের সাথে মীরজাফরের পূর্বেই এই মর্মে একটি চুক্তি ছিল যে, যুদ্ধে ইংরেজরা জয়ী হলে মীরজাফর হবেন বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব হবেন। বিনিময়ে মিরজাফর East India Company কে 5 Lakh Pound ও কোলকাতায় বসবাসকারি ইউরোপীয়দের আড়াই লক্ষ পাউন্ড প্রদান করবেন। ১৭৫৭ সালে নবাব সিরাজউদ্দৌল্লার পরাজিত, সিংহাসনচ্যুত ও নিহত হলে মীরজাফর বাংলার নবাব হন পরপর দুইবার ১৭৫৭-১৭৬০ এবং ১৭৬৩-৬৫ পর্যন্ত। তিনি শেষ বয়সে এসে খুব কষ্টে মৃত্যু বরণ করেন অর্থাৎ ১৭৬৫ এই বিশ্বাসঘাতকের মৃত্যু হয়।

এইভাবে আমাদের অভিজ্ঞ গাইডকে সাথে এবং তাঁর বিভিন্ন নবাব ও কার্যকলাপের কাহিনী শুনতে শুনতে প্রায় মুর্শিদাবাদের বিখ্যাত স্থান ঘোরা শেষ করলাম। সত্যিই বলতে ভ্রমন শেষ করে নিজেকে বড়ো ভাগ্যবান মনে করলাম। কারণ যে সব তথ্যগুলি ইতিহাস বইয়ের পাতাই লেখা ছিল বটে কিন্তু তা সামনাসামনি প্রত্যক্ষ করে আরও অনেক বেশি জ্ঞান আহরণ করতে পারলাম। আমার যাওয়ার মূল উদ্দেশ্য ছিল ইতিহাসের ছাত্র হিসাবে প্রত্যেক জিনিসকে নিরপেক্ষভাবে মূল্যায়ণ করা।

যাইহোক ঘোরাঘুরি শেষ করে ২৯/১০/২০২২ তারিখে বাড়ি ফিরলাম।

ম্যাজিক্যাল কেমিস্ট্রি (Magical Chemistry)

তনয়া ঘোষ
৪র্থ সেমেস্টার, বি.এসসি, কেমিস্ট্রি বিভাগ (অনার্স)

Chemistry খুবই interesting subject। Chemistry-র বিভিন্ন experiment গুলোকে কীভাবে আমরা আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহৃত ঘড়োয়া উপকরণের মাধ্যমে ম্যাজিকের মতো উপস্থাপন করতে পারি তারই কিছু নমুনা নীচে আলোচিত হল —

- **Lava Lamp (লাভা ল্যাম্প) ঃ**

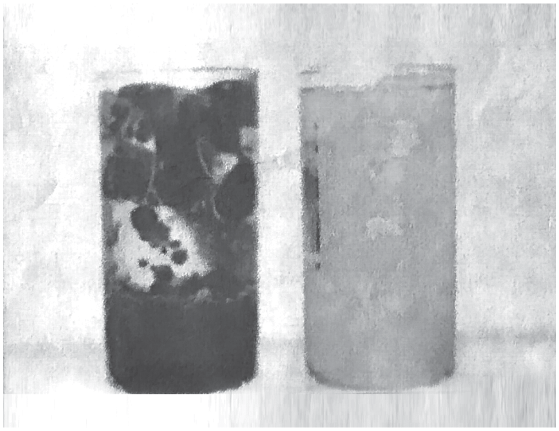

জল (Water).. রান্নার তেল (Cooking Oil).. ফুড কালার (Food Colour).. এফারভ্যাসেন্ট ট্যাবলেট (Efferuescent tablet)।

একটি কাচের গ্লাসে প্রথমে অল্প পরিমাণ জল দিয়ে তার উপর রান্নার তেল ঢালা হল। দেখা যাবে দুটো Layer (জল ও তেলের) আলাদা হয়ে গেছে। এবার অল্প পরিমাণ ফুড কালার এই গ্লাসে যোগ করলে দেখা যাবে কালারটি জলের সাথে মিশে যাচ্ছে। এবার একটি এফারভ্যাসেন্ট ট্যাবলেট এর মধ্যে ফেলে দিলেই বুদবুদ আকারে কালার নীচ থেকে উপরে উঠবে আবার নীচে নামবে। বিভিন্ন রঙের ফুড কালার ব্যবহার করলে বিভিন্ন রঙের লাভা পাওয়া যাবে।

একটি গোল LED ল্যাম্পের উপর গ্লাসটি রাখলেই তৈরি হয়ে যাবে লাভা ল্যাম্প।

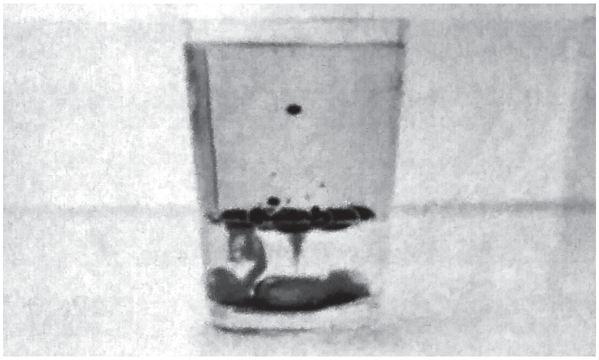

- **Rainbow (রামধনু) ঃ**

কাচের পাত্র-জল-চিনি (Sugar)-ফুড কালার (Food Colour)।

৫টি পাত্রে জল নিয়ে তাতে আলাদা রঙের ফুডকালার মেশানো হলো। এবার প্রথম পাত্রটি বাদ রেখে দ্বিতীয় পাত্রে এক চামচ, তৃতীয় পাত্রে দুই চামচ, চতুর্থ পাত্রে তিন চামচ ও পঞ্চম পাত্রে চার চামচ চিনি ও ভালো করে মেশানো হল, তারপর একটি ফাঁকা

কাচের গ্লাসে প্রথমে পঞ্চম, তারপর চতুর্থ, তারপর তৃতীয়, দ্বিতীয় ও প্রথম পাত্রে চিনির জল সাবধানে ড্রপার দিয়ে ভর্তি করা হল যাতে প্রতিটি Layer আলাদা করে বোঝা যায় এবং এই ভাবেই Rainbow তৈরি হয়ে গেল।

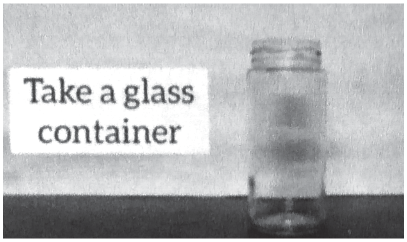

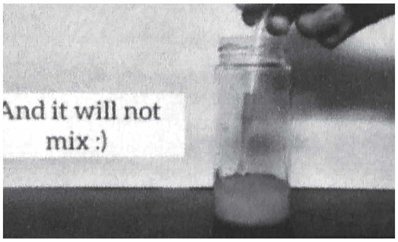

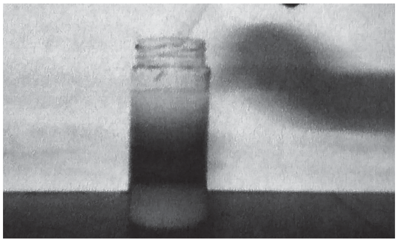

- **Fake blood (নকল রক্ত) ঃ**

পটাশিয়াম থায়োসায়ানেট - আয়রন ক্লোরাইড - ছুড়ি - কাচের পাত্র।

একটি পাত্রে পটাশিয়াম থায়োসায়ানেটের একটি মিশ্রণ তৈরি করা হল জলের সাহায্যে এবং অপর পাত্রে জল ও আয়রন ক্লোরাইডের অপর একটি মিশ্রণ তৈরি করা হল। এবার হাতে ও তালুতে সামান্য পটাশিয়াম থায়োসায়ানেটের মিশ্রণ ঢেলে শুকিয়ে নিতে হবে এবং ছুড়িটিকে আয়রন ক্লোরাইডের মিশ্রণে ডুবিয়ে হাতের তালুতে স্পর্শ করালে রক্তের মতো লাল হয়ে উঠবে তালুটি। এভাবে খুব সহজেই নকল রক্ত বানিয়ে সকলকে ধোকা দেওয়া যায়।

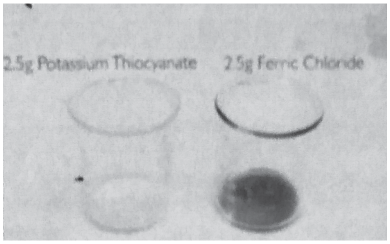

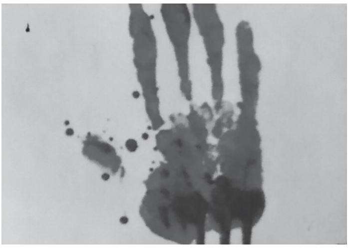

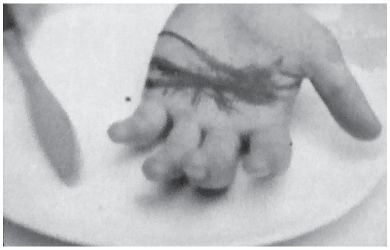

- **Gini in a bottle (বোতলের মধ্যে জিনি) ঃ**

35% হাইড্রোজেন পারক্সাইড (H_2O_2) - ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড (MnO_2) - ঢাকনা দেওয়া কাচপাত্র।

প্রথমে জিনি তৈরির জন্য কাচপাত্রে 50ml মতো H_2O_2 ঢালতে হবে। একটি টিস্যু পেপারে কিছুটা ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড নিয়ে সুতো দিয়ে বেধে মোড়ক বানিয়ে নিতে হবে। সুতোর অপর প্রান্তের সাহায্যে মোড়কটি ধীরে ধীরে বোতলের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে মুখ বন্ধ করে দিতে হবে, কিছু সময় পর বোতলের মুখ খুললে সাদা ধোঁয়া বার হতে দেখা যাবে। এভাবেই আমাদের জিনিও বোতল থেকে বার হয়ে আসবে।

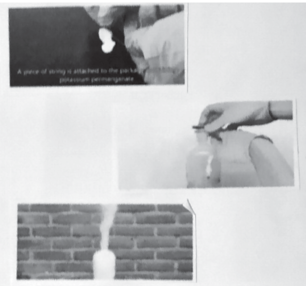

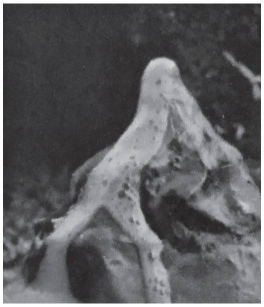

- **Volcano (আগ্নেয়গিরি) ঃ**

ভিনিগার - ফুড কালার - eno।

একটি বোতলের চারপাশে কাগজ দিয়ে আগ্নেয়গিরির আকৃতি তৈরি করা হল। বোতলের মধ্যে ভিনিগার ও ফুড কালার ঢালা হল। এবার উপর থেকে আস্তে আস্তে বোতলের মধ্যে eno ঢালা হলে দেখা যাবে বোতলের মুখ থেকে ফেনা নির্গত হচ্ছে এবং এভাবেই অগ্ন্যুৎপতি ঘটানো সম্ভব।

- **Invisible letter (অদৃশ্য চিঠি) ঃ**

বেকিং সোডা - জল - স্যানিটাইজার - ফুড কালার অথবা লেবুর রস।

একটি পাত্রে জল ও বেকিং সোডা মিশিয়ে কাগজের উপর তুলি দিয়ে চিঠি লিখে শুকিয়ে নেওয়া হল। এবার স্যানিটাইজার ও ফুড কালার মিশিয়ে চিঠিটির উপর বোলালে লেখাটি স্পষ্টটি হবে। অদৃশ্য চিঠিটি ফুটে উঠবে।

অথবা, লেবুর রস দিয়ে কাগজের উপর তুলি দিয়ে লিখে শুকিয়ে নিতে হবে। এবার কাগজটি অগুনে শেকে গরম করে অথবা ইস্ত্রীর সাহায্যে গরম করলে লেখাটি স্পষ্ট হবে।

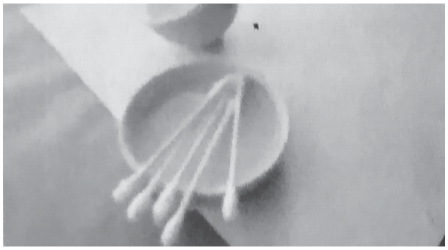

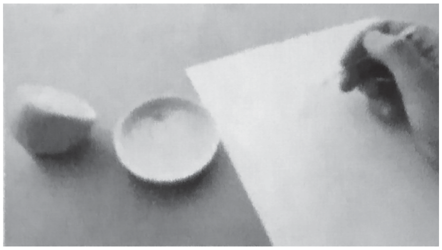

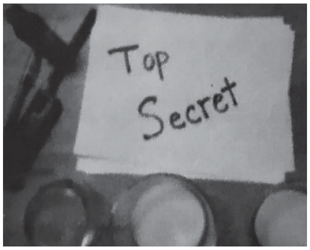

- **Black Snake (কালো সাপ) ঃ**

স্পিরিট - চিনি - সোডা - বালি।

একটি প্লেটে বালি নিয়ে তার উপর স্পিরিট ছড়ানো হল। বালির মধ্যে গর্ত করে সামান্য চিনি ও সোডা দিয়ে আগুন দিয়ে উত্তপ্ত করা হলে সাপের মতো কালো ফেনা তৈরি হবে।

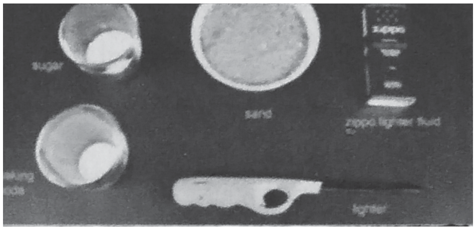

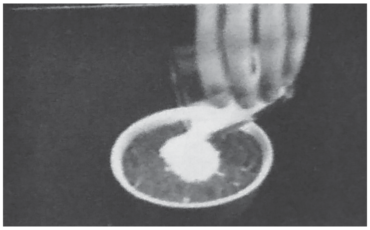

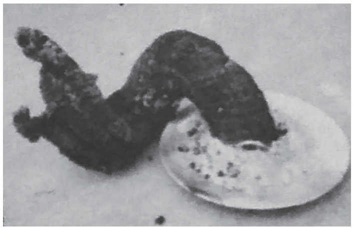

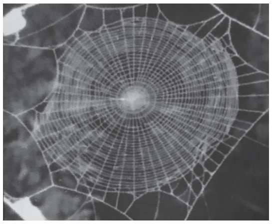

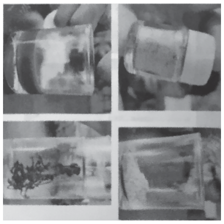

- **Spider web (মাকড়সার জাল) ঃ**

কপার কার্বোনেট - অ্যামোনিয়া - তুলো - জল - সালফিউরিক অ্যাসিড - সিরিঞ্জ।

একটি পাত্রে কপার কার্বোনেট এবং অ্যামোনিয়া নিয়ে মেশানো হল। এবার এতে তুলো ভেজানো হল। অন্য একটি পাত্রে জল ও কিছুটা সালফিউরিক অ্যাসিড নিয়ে তাতে সিরিঞ্জের মাধ্যমে কপার কার্বোনেট ও অ্যামোনিয়ার মিশ্রণ দেওয়া হলে, নীল জালের মতো তৈরি হবে। দ্রবণ থেকে তুলে নিয়ে একটু শুকিয়ে নিলেই মাকড়সার জাল তৈরি হয়ে যাবে।

- **Magic Sand (ম্যাজিকাল বালি) ঃ**

জল - হাইড্রোফোবিক বালি (Hydrophobic Sand)।

একটি পাত্রে জল নিয়ে তাতে হাইড্রোফোবিক বালি মেশালে দেখা যাবে বালিটি জমে যাবে। বালিটি জল থেকে তুলে আনলে দেখা যাবে বালিটি ভেজেনি শুকনো আছে।

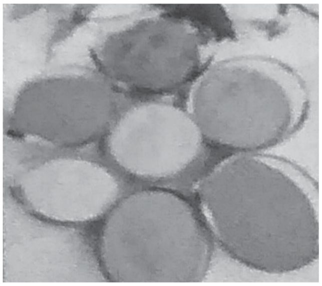

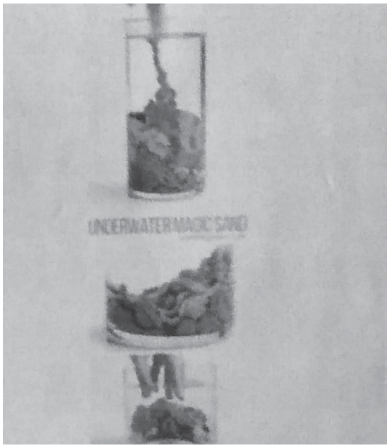

- **Magic X-mas tree (ম্যাজিকাল X-mas গাছ) ঃ**

X-mas এর আকারে কাগজের কাটিং - ফুড কালার - লবণ - জল - নীল রং - অ্যামোনিয়া।

X-mas true এর আকারে কাগজ কেটে কাগজের প্রান্তে অল্প ফুড কালার দেওয়া হল। একটি পাত্রে জল, লবণ, নীল রং, অ্যামোনিয়া দিয়ে তার মধ্যে X-mas টি বসিয়ে দেওয়া হলে দেখা যাবে গাছের প্রান্তে বিভিন্ন রঙের বরফের মতো crytal জমা হয়েছে। এভাবেই ম্যাজিকাল X-mas tree তৈরি করা যাবে।

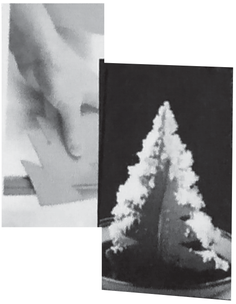

এক আদর্শ সমাজের সন্ধানে

শ্রমণা ধর
সহকারী অধ্যাপক, গণিত বিভাগ

মানুষ সামাজিক জীব এবং পরিবেশের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তাই গতানুগতিক পড়াশোনার পাশাপাশি সমাজের মানোন্নয়নের ভাবনাকে দৃষ্টি অগোচর করলে চলে না। ভুললে চলবেনা যে, আমাদের খাবার ফলিয়েছেন অন্যজন বা পরনের পোশাক বুনেছেন অন্যজন; তাই জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে সাধ্যমত সেই সমস্ত ঋণ শোধ করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। কেননা সামান্য অর্থের বিনিময় হয়েছে বলেই খাবারের প্রতি বা পোশাকের প্রতি উপভোক্তার পূর্ণাধিকার জন্মে যায় না, এক্ষেত্রে উৎপাদকের অবদান বরাবরই অনস্বীকার্য।

কিন্তু কোনও এক অজ্ঞাত কারণে ধনীরা উত্তরোত্তর ধনীতর হয়ে চলেছে আর পক্ষান্তরে গরীবেরা গরীবতর। এর সমাধান তখনই সম্ভব যখন অর্থের অবাধ এবং স্বতস্ফূর্ত প্রবাহ ধনী থেকে গরীবের দিকে হবে। ঠিক যেমনটা পরমাণুর উচ্চশক্তিসম্পন্ন কক্ষের ইলেকট্রনগুলো অতিরিক্ত শক্তি নিঃসরণ করে নিম্নশক্তিসম্পন্ন কক্ষে অবতীর্ণ হয় এবং স্থায়ীত্ব লাভ করে।

আচ্ছা, আজ যদি সবাই নিজেদের জামাকাপড় নিজেরাই ধুতে শুরু করে, নিজেদের জুতো নিজেরাই সেলাই করে বা পায়ে হেঁটে যাতায়াত করতে থাকে তাহলে এই প্রবাহ বাধাপ্রাপ্ত হয় বৈকি। মোটকথা পেশাগতভাবে পরিষেবা-প্রদানকারী মানুষের থেকে ‘‘না-নিলেও-চলে’’ ধরনের পরিষেবাগুলো নেওয়ার ক্ষেত্রেও আমাদের খানিকটা মনোনিবেশ করা উচিত। যেমন ধরুন, কোথাও বেড়াতে গেলে অপ্রয়োজনে রিক্সা-ভ্যান ব্যবহার করুন বা স্বল্পস্বাদ হবে তা জানা সত্ত্বেও ভেলপুরী, ফুচকা ইত্যাদি খান।

ফুটপাতে বসে থাকা মুচির সামনে দিয়ে হেঁটে গেলে দেখবেন উনি আপনার জুতোর দিকে ছলছল নয়নে একরাশ আশার আলো নিয়ে তাকিয়ে আছেন। আর আপনি যখনই ওনাকে অতিক্রম করে আপনার গন্তব্যের দিকে অগ্রসর হবেন ওই চাহনির উজ্জ্বলতা ক্রমশ ফিকে হতে থাকবে। চোখের এই ভাষা বোঝার বিদ্যা জানিনা কোন বিষয়ে, কোন প্রতিষ্ঠানে পড়ানো হয়। তবে অচিরেই এই শিক্ষার প্রয়োজন হয়ে পড়বে আমাদের সমাজে।

কতদিনই তো অমুক রেস্তোরার তমুক মেনুকার্ড চিরুনি তল্লাশি করে ‘‘ধিনচ্যাক মাটন কবিরাজী’’ অর্ডার করে শেষমেশ ঢেঁড়সসেদ্ধসম ‘‘কিছু-একটা’’ খেতে বাধ্য করেছেন নিজেকে। স্থান, কাল, পাত্র বুঝে দৃষ্টিভঙ্গিও পাল্টানো দরকার। মনে রাখতে হবে, মানুষ কিন্তু এখনও রোবট হয়ে ওঠেনি, বরঞ্চ রোবটকেই আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স এর মাধ্যমে আরও একটুখানি মানুষের মত মানুষ করে গড়ে তুলতে প্রযুক্তিবিদরা উঠে পড়ে লেগেছেন যাতে কিনা চালকবিহীন গাড়ি বা পরিচারিকার কাজে ব্যবহার করা যায়।

গরীবের অন্ন যোগানোর চেষ্টাতে কিঞ্চিৎ হার স্বীকার করলেও তাতে খুব বেশি গ্লানি আছে বলে মনে হয় না, বরঞ্চ আছে এক অদ্ভুত আত্মসন্তুষ্টি। প্রত্যাশা এটাই থাকুক আজ যে এমন এক সমাজ আসুক অদূর ভবিষ্যতে যেখানে সবাই নিদেনপক্ষে মাটিতে পা রেখে চলবে, স্বপ্ন থাকুকনা আকাশছোঁয়া, ক্ষতি নেই।

প্রসঙ্গত জনৈক মণীষী বলেছিলেন, সমাজের উৎকর্ষতা বহুলাংশে নির্ভর করে নিম্নকোটির মানুষের প্রতি উচ্চকোটির মানুষের কেমন দৃষ্টিভঙ্গি তার উপরে কেননা বিপরীতক্রমটি হল একরূপ ভীতিসমন্বিত প্রভুত্ববাদ, যা বরাবরই থেকে এসেছে, থাকবেও, সেটার প্রয়োজনের খাতিরেই, অনেকটা অনিচ্ছাসত্ত্বেও।

শিক্ষা তো কেবল ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণের চাবিকাঠি নয়!

শেখ আব্দুল মাবুদ
স্নাতক, গণিত বিভাগ (২০২২)

এই বেশ কিছু দিন আগে একটি জনপ্রিয়তা ওয়েব সিরিজ দেখছিলাম, সেখানে একজন শিক্ষক ছাত্রকে শেখাচ্ছে কি ভাবে নিজের প্রয়োজনে মা কে ব্যবহার করতে হয়। এমন মনোবৃত্তি ছাত্র সমাজে অহরহ বেড়ে চলেছে। নিজের ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা বা তথাকথিত ক্যারিয়ারের প্রবৃদ্ধির জন্য ন্যায় নৈতিকতার বিসর্জন দিচ্ছে। শিক্ষা যে ক্রমাগত ক্রমবর্ধমান হারে বাণিজ্যিকরণের পথে অগ্রসর হচ্ছে, সেই বিষয়ে সকলেই প্রায় অবগত। আর শিক্ষার বাণিজ্যকরণ এমন মানসিকতা তৈরিতে অভাবনীয় অবদান রাখছে। যার ফল স্বরূপ ছাত্র সমাজ ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে পড়ছে, ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা ক্রমাগত অসীমগামী। এমনকি স্বপ্নপূরণের জন্য পারিবারিক দায়িত্ব সামাজিক বোধ থেকে পিছু হঠছে। নিজেদের কেবল পুঁথিগত বিদ্যা ও নিজের বিনোদনিক উপাদানের উপজীব্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখছে। নূন্যতম রাজনৈতিক বোধ, সেটিও গড়ে উঠছে না। এমন পরিস্থিতির অধিকাংশ দায় ছাত্র সমাজের তবে পুরোটা নয়। আসলে এই প্রতিযোগিতার বাজারে টিকে থাকতে গেলে তো নিজেকে পণ্য বানাতে হবে। কিন্তু শিক্ষা যে কেবল পণ্য বানানোর জন্য নয়, শিক্ষা তো আমাদের ব্যক্তি চেতনার উন্মেষ ঘটায়। আর 'ব্যক্তি চেতনা' প্রস্ফুটিত হতে গেলে প্রয়োজন নিজের ও নিজের পারিপার্শ্বিক আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটকে উপলব্ধি করা। আর এই উপলব্ধি তো স্বয়ংক্রিয় ভাবে সঞ্চিত হয় না, এই উপলব্ধি সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে পঠন পাঠন পদ্ধতি। আবার এই পঠন পাঠন পদ্ধতিতে রয়েছে অজস্র গলদ। আমাদের গণিতে (গণিতের স্নাতকের পাঠ্যসূচিতে) Calculus, Numerical analysis, Probability, Statistics ও LPP এর মতো বিষয় পড়ছি, কিন্তু এই পড়া কেবল পুঁথিগত বিদ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু যদি পাঠ্যসূচিটা একটু অন্য রকম করা যেতো, যেখানে এই সকল বিষয়গুলির সাহায্য নিয়ে আমাদের আঞ্চলিক কিছু সমস্যা ও তার সমাধান বিশ্লেষণ করে প্রজেক্ট আকারে জমা দিতে হবে। তার ফলে হয়তো বিভিন্ন আঞ্চলিক সমস্যা সম্পর্কে আমরা আরও অবগত হতে পাড়তাম, নিজেদের মধ্যে বেড়ে ওঠা আত্মকেন্দ্রিকতার পরিমাণটা হয়তো একটু কমতো। আবার কোনো ছাত্র বা ছাত্রী সেই সমস্যার বাস্তবিক সমাধান তুলে ধরতে পারতো। এমন নয় যে এটা কেবল গণিতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, প্রতিটি বিষয়ে এমন কিছু উপবিষয় থাকে যেগুলির সাহায্য অজস্র বাস্তবিক সমস্যার সমাধান বিশ্লেষণ করা যেতেই পারে।

আমরা মানব জাতি সামাজিক প্রাণী আর আমাদের মধ্যে যদি কেবল আত্মকেন্দ্রিকতা ও ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রাধান্য পায় তবে আমাদের সমাজ ব্যবস্থা ভারসাম্য হারিয়ে ফেলবে। আর এই মনোবৃত্তিকে প্রশমিত করতে পারে প্রকৃত বাস্তবিক শিক্ষাদান পদ্ধতি।

(মতামত সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত)

গণিত কেন পড়বো

শেখ আব্দুল মাবুদ
স্নাতক, গণিত বিভাগ (২০২২)

আমরা গণিতের ছাত্র তাই মাঝে মধ্যে মনে প্রশ্ন জাগতেই পারে গণিত পড়ে হবেটাই বা কি, দৈনন্দিন জীবনে গণিতের ভূমিকাটাই বা কি? এই সকল প্রশ্নের প্রথম যে উত্তরটা মাথায় আসে সেটি হলো, বিজ্ঞানের সূত্র গুলিকে গণিতের সাহায্যে প্রকাশ করে গাণিতিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন সম্ভব হয়েছে এবং ক্রমাগত হয়ে চলেছে। তবে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে গণিত কি ভাবে নিজের প্রভাব বিস্তার করে চলেছে সেই বিষয়ে একটু আলোকপাত করা যাক। একুশের বঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের সময় একটি নাম খুব জনপ্রিয় হয়েছিল ভোট কৌশলী প্রশান্ত কিশোর। আচ্ছা এই প্রশান্ত কিশোর বাবু ও তার টিম করেটা কি? তৃণমূল স্তর থেকে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে এনে সেই তথ্য গুলোকে নানান রকম গাণিতিক পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করে তার ভিত্তিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক কৌশল তৈরি করে। বর্তমানে বিকল্প মুদ্রা বিসাবে বিটকয়েন (bitcoin) বেশ জনপ্রিয় হয়েছে, কিন্তু এই বিটকয়েন কাজ করে কি ভাবে? এই বিটকয়েন চালনা করা হয় বিভিন্ন গাণিতিক সংকেতের মাধ্যমে, যাকে ব্লকচেইন (blockchain) বা ক্রিপ্টোগ্রাফি (cryptography) পদ্ধতি বলা হয়। বর্তমানে এই ক্রিপ্টোগ্রাফির ব্যবহার ক্রমশ বেড়ে চলেছে, যেমন গোপন তথ্য আদান প্রদান বা banking transaction এর ক্ষেত্রে। বর্তমানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা artificial intelligence সর্বত্র অদৃশ্য হাতের মতো করে আমাদের কে নিয়ন্ত্রণ করছে, আর এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নেপথ্যে রয়েছে বিভিন্ন গাণিতিক উপায়। এখন বুর্জ খলিফার মতো আকাশচুম্বী অট্টালিকা তৈরি হচ্ছে আর এই সব আকাশচুম্বী অট্টালিকা ও আঁকাবাঁকা সেতু নির্মাণে কলনবিদ্যার ভূমিকা অনস্বীকার্য। এছাড়া শেয়ার মার্কেট যেখানে সমস্তটাই গণিতের উপর ভিত্তি করে চলে। আসলে সর্বত্র কোনো না কোনো ভাবে গণিতের ছোঁয়া আছে। তাই সর্বোপরি ভাবে বলতে গেলে এই পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থাকে চলমান রাখতে নেপথ্য কারিগর হিসাবে গণিত তার অবস্থান সর্বদা সজীব রেখে চলেছে। তাই এই সমাজে চলতে গেলে গণিত জানা অন্তত প্রয়োজন।

গ্রীক গণিতবিদ আর্কিমিডিসের ভাষায়, ‘গণিত তার কাছেই তার সৌন্দর্য নিয়ে ধরা দেয়, যে বিশুদ্ধ মন ও ভালোবাসা নিয়ে গণিতের দিকে অগ্রসর হয়’। আর যেহেতু গণিত জানাটা একান্ত আবশ্যিক তাই বিশুদ্ধ মন ও গণিতের প্রতি ভালোবাসা নিয়ে গণিত শেখার কোনো বিকল্প নেই।

The Abel Prize

Sahani Parvin
Graduate, Department of Mathematics (2021)

There is no Nobel prize for mathematics, but many mathematicians have won the prize, most commonly for physics but occasionally for economics and in one case for literature. The Abel Prize is instead to give the mathematicians their own equivalent of a Nobel Prize. The Abel Prize dates back to 1899 when its establishment was proposed by the Norwegian mathematician Sophus Lie, when he learned that Alfred Nobel's plans for annual prizes would not include a prize in mathematics. The award was first proposed in 1902 by King Oscar ll of Sweden and Norway, just a year after the award of the first Nobel Prizes. However, the plans were dropped as the union between two countries was dissolved in 1905. As a result mathematics has never had an international prize of the same dimension and importance as the Nobel Prize.

Plans for awarding the Abel Prize were revived in 2000, and in 2001 the Norwegian Government granted NOK 200 million (about $22 million) to create the new award . Niels Henrik Abel (1802-1829), after whom the prize is named, was a leading 19th century Norwegian mathematician whose work in algebra has had lasting impact despite Abel's early aged. Today every mathematics undergraduate encounters Abel's name in connection with commutative groups which are more commonly known as "abelian groups".

As it happens, Abel's own field of group theory plays a role in the Atiyah-Singer Index Theorem, but this is not a condition for the award of the Abel Prize. The Abel Prize is awarded annually, and is intended to present the field of mathematics with a prize at the highest level. Laureates are nominated by an independent committee of international mathematicians.

As a result of Norway's action, made in part to celebrate the 200th anniversary of Abel's birth in 2002, mathematicians now to have an award equivalent to the Nobel Prize. In addition to honoring outstanding mathematicians, the abel prize shall contribute towards raising the status of mathematics in society and stimulating the interest of children and young people in mathematics.

Published in E-Magazine

মটন কষা

শুভদীপ ঘোষ
বিজ্ঞান স্নাতক, ৪র্থ সেমেস্টার

মটন কষা একটি আইকনিক বাঙ্গালী খাবার। কষা শব্দটি ভুনার অর্থের অনুরূপ, যার মধ্যে একটি সমৃদ্ধ, গাঢ়-বাদামী গ্রেভি এবং মুখের মধ্যে গলে যাওয়া মাটনের টুকরো পেতে খুব দীর্ঘ সময়ের জন্য কম আঁচে একটি গ্রেভি রান্না করা জড়িত। এটা উল্লেখ করার মতো যে বাংলার পাশাপাশি ভারতেও সাধারণত ছাগলের মাংস বোঝাতে মাটন ব্যবহার করা হয়। মাটন কষা পরোটা বা পোলাও দিয়ে পরিবেশন করা যেতে পারে। সাধারণ ভাতের সাথেও এটি দারুণ স্বাদের। এই শৈলীর মাটন কষা বিক্রির অন্যতম বিখ্যাত দোকান কলকাতার শ্যামবাজার ক্রসিংয়ের গোলবাড়ি। আপনাকে নিশ্চিত করতে পারি যে এটি অবশ্যই খুব ভাল স্বাদযুক্ত।

উপাদান

১ কেজি মাটন
Marinade জন্য
১০০ গ্রাম পেঁয়াজ
৫ গ্রাম রসুন
১০০ গ্রাম দই
১৫ গ্রাম লবণ
৫ গ্রাম হলুদ গুঁড়ো
৩ গ্রাম শাহী গরম মশলা পাউডার

তরকারির জন্য

২০ গ্রাম সরিষার তেল
৪ সেমি দারুচিনি
১০ পিস সবুজ এলাচ
১ পিস কালো এলাচ
১০ পিস লবঙ্গ
৪ পিস শুকনো লাল মরিচ
৬ পিস তেজপাতা
৪০০ গ্রাম পেঁয়াজ (কাটা)
৪০ গ্রাম আদা পেস্ট
১০ গ্রাম রসুন
২০ গ্রাম সবুজ লঙ্কা (সাজানোর জন্য অতিরিক্ত ৪ টুকরো)
৩ গ্রাম ধনে গুঁড়ো
৩ গ্রাম জিরা গুঁড়ো
৩ গ্রাম কাশ্মীরি লাল লঙ্কা গুঁড়ো
১৫০-২০০ গ্রাম দই
১ লিটার গরম জল
৫ গ্রাম ঘি

পদ্ধতি

ধাপ ১

মেরিনেডের জন্য, গ্রাইন্ডারের পাত্রে ১০০ গ্রাম পেঁয়াজ, ৫ গ্রাম মোটামুটি কাটা রসুন, ১০০ গ্রাম দই, ১৫ গ্রাম লবণ, হলুদ এবং শাহী গরম মসলা যোগ করুন। একটি মসৃণ পেস্ট গঠন করুন।

ধাপ ২

সমস্ত মাটনের টুকরোগুলিকে মেরিনেড দিয়ে কোট করুন, নিশ্চিত করুন যে মাংসের সব অংশে মশলা প্রবেশ করে। ঢেকে রাখুন এবং মাটনটিকে প্রায় ১-২ ঘণ্টা ফ্রিজে ম্যারিনেট করতে দিন।

ধাপ ৩

৪০০ গ্রাম পেঁয়াজ পাতলা টুকরো করে কাটুন। এই রেসিপিটির জন্য, কাটা পেঁয়াজ তরকারির গঠন নির্ধারণ করে। আলাদা করে ১০ গ্রাম রসুন এবং ২০ গ্রাম সবুজ লঙ্কা একসাথে পেস্ট করুন।

ধাপ ৪

একটি বড় কড়াই গরম করে তাতে সরিষার তেল দিন। তেল হালকা ধোঁয়া শুরু হয়ে গেলে এবং রঙ পরিবর্তন করে ফ্যাকাশে হলুদ হয়ে গেলে, শুকনো লাল লঙ্কা, তেজপাতা, দারুচিনি, সবুজ এলাচ, কালো এলাচ এবং লবঙ্গ যোগ করুন।

ধাপ ৫

পেঁয়াজ যোগ করুন এবং মাঝারি আঁচে প্রায় ১৫ মিনিটের জন্য ভাজুন যতক্ষণ না সেগুলি হালকা বাদামী হয়। তারপর, আদা পেস্ট, এবং রসুন এবং কাঁচা লঙ্কা পেস্ট যোগ করুন, এবং আরও ৫ মিনিটের জন্য ভাজুন। আপনার পেঁয়াজ প্যানে লেগে আছে কি না তার উপর নির্ভর করে আঁচ মাঝারি থেকে কম রাখুন এবং প্রায়ই নাড়ুন। আমরা মশলা ভাজার পাশাপাশি পেঁয়াজের গায়ে রঙ ফুটাতে চাই। এর পরে, ১০০ গ্রাম জলের সাথে মিশ্রিত শুকনো মশলা (ধনে, জিরা এবং লাল মরিচ) যোগ করুন। আরও ১৫ মিনিটের জন্য মশলা সহ পেঁয়াজ ভাজতে থাকুন। এখন পর্যন্ত (আমাদের শুরু করার ৩০ মিনিট হয়ে গেছে), আপনার পেঁয়াজগুলি একটি লালচে-বাদামী রঙ নেওয়া উচিত এবং মশলাগুলি তাদের তেল ছেড়ে দিতে শুরু করেছে।

ধাপ ৬

প্যানে ম্যারিনেট করা মাটন যোগ করুন। মাটন ফ্রিজে রাখা হয়েছে, তাই ঠান্ডা। আঁচ বাড়ান এবং সবকিছু পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মিশ্রিত করুন। মাটনটি ভাজুন, ঘন ঘন নাড়তে থাকুন যাতে এটি প্যানের সাথে লেগে না থাকে, উচ্চ তাপে ১৫ মিনিটের জন্য। ১৫০-২০০ গ্রাম ফেটানো দই যোগ করুন। এছাড়াও এই সময়ে ৪ গ্রাম লবণ এবং ১০ গ্রাম চিনি যোগ করুন। সবকিছু মিশিয়ে ভাজতে থাকুন। একবার আর্দ্রতা (ঠান্ডা মাটন এবং দই থেকে) শুকাতে শুরু করলে, আঁচটি মাঝারি করে দিন।

ধাপ ৭

এখন অনেক কিছু নেই। মাঝারি আঁচে, পরবর্তী ৭৫ থেকে ৯০ মিনিটের জন্য, নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি পুনরাবৃত্তি করুন ঃ— প্যানে গরম জলের স্প্ল্যাশ যোগ করুন (একবার - ৩০ মিলি) – এটি নাড়ুন-প্যানটি ঢেকে দিন এবং এক মিনিট রান্না করুন-অনেকবার করুন এবং সবকিছু খুব ভালোভাবে নাড়ুন আমরা এখানে যা করছি তা হল এক ধরনের নিয়ন্ত্রিত ব্রাউনিং। প্যানের নীচে আটকে থাকা বাদামী বিটগুলিকে নাড়ুন, স্ক্র্যাপ করুন এবং একত্রিত করুন, কারণ এটিই মাটনটিকে একটি সমৃদ্ধ রঙ তৈরি করতে দেয়। যাইহোক, সতর্ক থাকুন যাতে গ্রেভি পুড়ে না যায় এবং তিক্ত হয়ে না যায়। একবারে অল্প অল্প করে জল যোগ করতে থাকুন এবং গ্রেভিতে মাংস রান্না করতে থাকুন।

ধাপ ৮

একবার আপনি রঙের সাথে খুশি হয়ে গেলে, গ্রেভি/কারির জন্য যতটা চান জল যোগ করুন। এছাড়াও স্বাদের জন্য প্রায় ৪টি কাটা সবুজ লঙ্কা যোগ করুন। মাটন খুবভালো ভাবে সিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত ঢেকে রান্না করুন। আপনি এটি দুটি আঙ্গুল দিয়ে বিচ্ছিন্ন করতে সক্ষম হওয়া উচিত।

ধাপ ৯

আঁচ বন্ধ করে উপরে অল্প ঘি দিয়ে নামিয়ে নিন। পরিবেশন করার আগে ঢেকে প্রায় ২ মিনিটের জন্য বিশ্রাম দিন।

হান্ডি মটন

অভীক মণ্ডল
বিজ্ঞান স্নাতক, ৪র্থ সেমেস্টার

হান্ডি মাটন ভারতের উত্তরাঞ্চলের সবচেয়ে প্রিয় মাটন এবং সুস্বাদু খাবারগুলির মধ্যে একটি। এটি হান্ডি বা মাটির পাত্রে দীর্ঘ ঘন্টা ধরে রান্না করা হয়। হান্ডি মাটনে সাধারণত ভেড়ার হাড় থাকে এবং ধীরগতিতে কুকিং করলে সবচেয়ে ভালো স্বাদ পাওয়া যায়। রান্না শুরু করতে, নীচের ধাপে ধাপে এই সহজ রেসিপিটি অনুসরণ করুন।

উপাদান

১ টি মাঝারি মাটির হাঁড়ি (ঢাকনা যুক্ত)
১ কেজি ভেড়ার বা খাসির মাংস
৩ টেবিল চামচ টক দই
২ চা চামচ লাল লঙ্কা গুঁড়ো
১ টি কালো এলাচ
৩ টি রসুন বাটা
২ চা চামচ ধনে গুঁড়ো
৬০০ গ্রাম পেঁয়াজ কুচি
৪০-৫০ মিলি সরিষার তেল
২ চা চামচ হলুদ
৫ টি সবুজ এলাচ
৫০ গ্রাম আদা পেস্ট
২ চা চামচ গরম মশলা গুঁড়ো
২ চা চামচ গোটা জিরা
১০-১৫ টি গোলমরিচ
৫ টি শুকনো লঙ্কা
প্রয়োজন অনুযায়ী লবণ

পদ্ধতি

ধাপ ১

মাটন ধুয়ে ম্যারিনেড করুন, মাটনের টুকরোগুলো পুরোপুরি পরিষ্কার করে নিন এবং দই, হলুদ গুঁড়ো, লাল মরিচের গুঁড়ো, লবণ, অল্প সরিষার তেল, ৬০০ গ্রাম পেঁয়াজ কুঁচি, আদা রসুন পেস্ট এবং ধনে গুঁড়ো যোগ করুন। এই মেরিনেশনটি মাটনের টুকরোগুলিকে ভালো করে মাখুন এবং ৩০ মিনিট-১ ঘণ্টা ফ্রিজে রাখুন।

ধাপ ২

একত্রিত করুন, রান্না করুন এবং পরিশেন করুন।

একটি প্যানে বাকি সরষের তেল গরম করুন এবং ভালো করে ধুয়ে গরম করে রাখা শুকনো মাটির হাঁড়িতে অল্প দিন তার মধ্যে দিন শুকনো লঙ্কা ২-৩ টে, কিছু গোল মরিচ, গোটা গরম মশলা (লবঙ্গ, সবুজ এলাচ, জিরা, দারুচিনি), এর মধ্যে দিয়ে দিন ম্যারিনেট করে রাখা মাংস এবং বাকি তেল ওই হাড়িতে ঢেলে দিন। এরপর হাঁড়ির মুখটাকে ভালো করে আটার লেই এর সাহায্যে বন্ধ করে দিন ও লো ফ্লেম এ বসিয়ে দিন।

ধাপ ৩

এরপর ১০ মিনিট অন্তর মুখ না খুলেই ঝাঁকাতে থাকুন এভাবে ১ ঘণ্টা রান্না করুন। তারপর পর মুখ খুলে দিন এবং গরম ভাত বা নানপুরির সাথে পরিবেশন করুন গরম গরম হান্ডি মাটন।

জীবন ও অবসাদ

দিয়া পাল
বিজ্ঞান স্নাতক, ২০২১

জীবন শব্দটির মাহাত্ম্য অনেকখানি। মানুষের জীবন শুধুমাত্র ''অস্তিত্বের জন্য জীবন সংগ্রামে'' সীমাবদ্ধ নয়। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রাণী হওয়ায় মানুষ তার এই নির্ধারিত এবং সীমাবদ্ধ সময়টিকে পূর্ণ মাত্রায় উদ্‌যাপিত করে। নিজের ভালো থাকা, অপরকে ভালো রাখা, অন্যান্য জীবনের মঙ্গল সাধন করা, এই ধরণীকে আরো উন্নত করা এবং অবশ্যই পরবর্তী প্রজন্মের চলার পথ আরো মসৃণ করা — এসবের মধ্য দিয়ে মানুষের জীবন অতিবাহিত হয়ে চলেছে। আর অন্যান্য প্রাণীর থেকে উন্নত হওয়ার কারণেই আমাদের জীবনের জটিলতা ও অনেক বেশি। সেই কারণে চলার পথে প্রতি পদক্ষেপে আমাদের নানা অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়।

বিশেষ করে ১৮ থেকে ২৭ বছর বয়সীদের জীবনে নানারকম সমস্যা আসতে শুরু করে। একদিকে যেমন পড়াশোনার চাপ অনেক বেশি, তেমনি থাকে কিছু Confusion-কি নিয়ে পড়বো, কোন Stream-এ যাবো, কোন দিকে Better achievement - এমনই নানা কিছু। কারোর বা Higher studies-এর ইচ্ছা অনেক সময় পরিবারের Economical condition-এর জন্য স্থগিত রয়ে যায়। আবার কারও বা এ সমস্ত কিছুর বাইরে থাকে অন্যরকম Passion, যা হয়তো নানা পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির কারণে সুপ্ত রেখেই বিকল্প পথ অবলম্বন করতে হয়। এছাড়াও Career এর চিন্তা তাছাড়া Economical crisis - ও কারো কারো নিত্যদিনের সঙ্গী। আর সঙ্গে বয়সোচিত কিছু ব্যক্তিগত সমস্যা তো আছেই।

এই সময়টি life এর সবচেয়ে সুন্দর সময়। কিন্তু problems এর পরিমাণ যদি বেশি হয়ে যায়, তখন সাময়িকভাবে একটি হতাশাজনক মনোভাব আমাদের গ্রাস করে, যার নাম "Depression" বা অবসাদ। আর এই অবসাদ অনেক ক্ষেত্রে মানুষকে মানসিকভাবে ভেঙে দিতে পারে। এটি যে কোন কারণেই সৃষ্টি হতে পারে। বিশেষ করে যদি হঠাৎই অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে মানুষ অসফল হয় অথবা দীর্ঘদিন ধরে কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যর্থতা আসতে থাকে হতাশা আমাদের হৃদয়কে গ্রাস করে।

এই সময় গুরুতরভাবে যে ভুলটা ঘটে তা হল নিজের প্রতি আস্থা হারানো। নিজের সমস্ত আত্মবিশ্বাস ক্ষীণ হতে শুরু করে। মনে হয় যেন, আর কিছুই ঠিক হওয়া সম্ভব না। সমস্যা যতটা গুরুতর, তার থেকে অনেক বেশি খারাপ মনে হয়। কিন্তু কোন পরিস্থিতিতেই হাল ছেড়ে দেওয়া অথবা আস্থা-হারানো উচিত নয়। প্রতিটি মানুষের কাছেই তার নিজের থেকে বড় অবলম্বন কিছুই নেই। চাইলেই নিজেই মানুষ নিজের সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু হতে পারে। ব্যর্থতার জন্য হতাশ হওয়া উচিত নয়। কারণ,

"Looser stop when they fail, winners fail till they succeed."

প্রত্যেক সফল ব্যক্তির জীবনে আছে অনেকগুলি অসফল বছর। তাই ভুল পদক্ষেপ থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজের লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হতে হবে। স্বপ্ন সেটা নয় যা মানুষ ঘুমিয়ে দেখে, স্বপ্ন সেটাই যা মানুষকে ঘুমাতে দেয় না। নিজের অন্তরের অদম্য ইচ্ছা কে বিলীন হতে দেওয়া উচিত নয়।

অনেক সময়, অবসাদ মুক্ত হতে আমরা নানা Motivational speech শুনি বা আরও অন্যান্য অনেক কিছুই করি। তা আমাদের

মনোবল সাময়িকভাবে বাড়িয়ে তুললেও সময়ের অবকাশে আস্তে আস্তে বিলীন হয়ে যায়। কিন্তু আমরা যদি নিজেরাই নিজেদের Life এর Motivation খুঁজে পেয়ে যাই তবে আর কখনোই চলার পথে থমকে যেতে হবে না। আসলে,

“Impossible itself says I am possible.”

প্রতিটি অন্ধকার রাত্রির পর যেমন সূর্যোদয় নিশ্চিত, তেমনি দুঃসময়ও একসময় কেটে যেতে বাধ্য। কোন পরিস্থিতিই চিরস্থায়ী নয়। শুধুমাত্র শক্তভাবে ধৈর্যের সাথে বিরূপ সময় এর মোকাবিলা করতে হবে।

Life is too limited তাই প্রত্যেকটা মুহূর্তকে উদ্‌যাপিত করা উচিত। আসলে, আমাদের চাহিদাগুলি বড়ই আপেক্ষিক। সফল কোন ব্যক্তির সাপেক্ষে নিজেকে যেমন কমজোর মনে হয়, ঠিক তেমনি অপর দিকে দেখা যাবে অনেক মানুষ এমনও আছে যাদের সমস্যার সাপেক্ষে নিজের গুলো বড়ই মূল্যহীন মনে হবে। তাই নিজের সাধ্যানুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কিন্তু কোনভাবেই Depression আমাদের Life এ কাম্য নয়।

অবশেষে বলবো,

“The life will never give us a second chance. So do not spoil the time. Story stay with hope and be positive. Time is not perfect itself. Try to make it favourable. Stay positive, everything will become positive at a time.”

Published in E-Magazine

Sohini Imtiaz
Graduate, Department of Mathematics (2022)

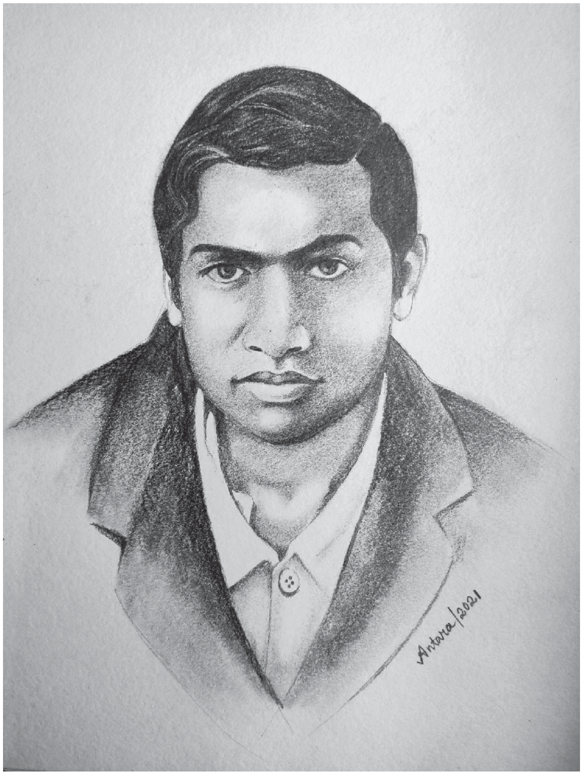

Antara Biswas
Graduate, Department of Mathematics (2022)

Published in E-Magazine

Bhaswati Mukhopadhyay
Graduate, Department of Mathematics (2022)

Bhaswati Mukhopadhyay
Graduate, Department of Mathematics (2022)

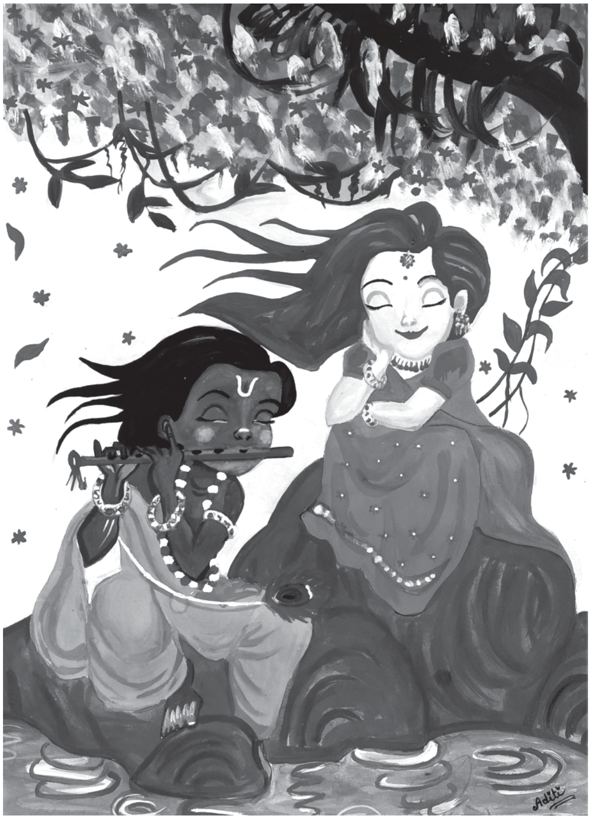

Aditi Das
B.Sc., Passed Out Batch 2021

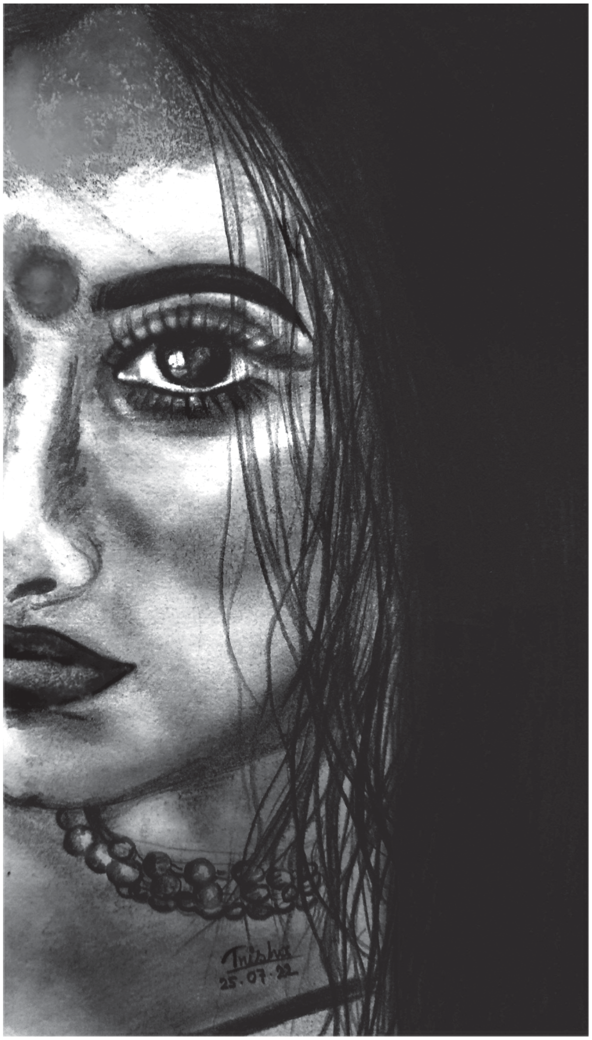

Trisha Pramanik
B.Sc., 4th Semester

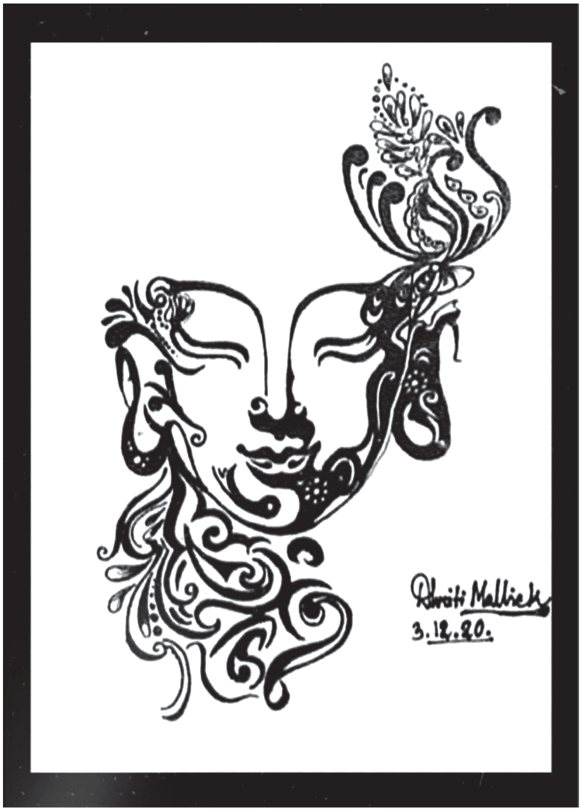

Dhriti Mallik
B.Sc., 4th Semester

Avik Mondal
B.Sc., 4th Semester

Published in E-Magazine

Subhamoy Mukherjee
B.Sc., Passed Out Batch 2021

Subhamoy Mukherjee
B.Sc., Passed Out Batch 2021

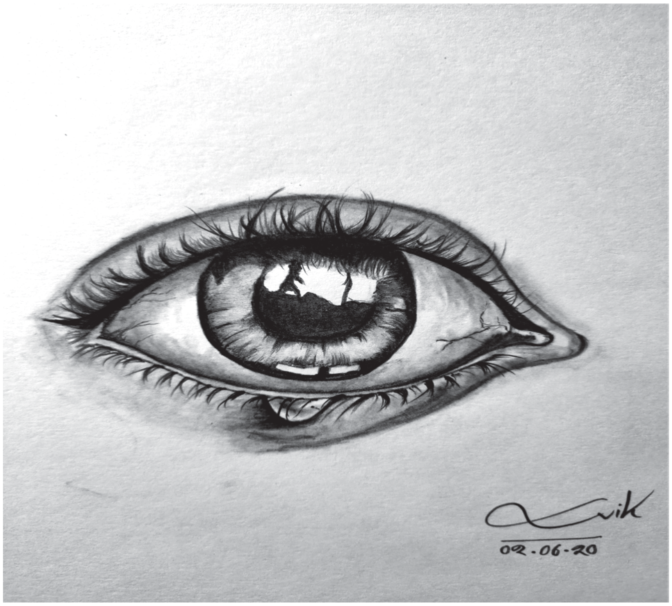

Avik Mondal
B.Sc., 4th Semester

Published in E-Magazine

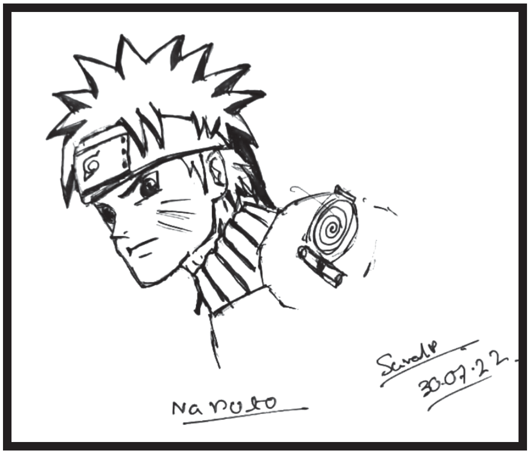

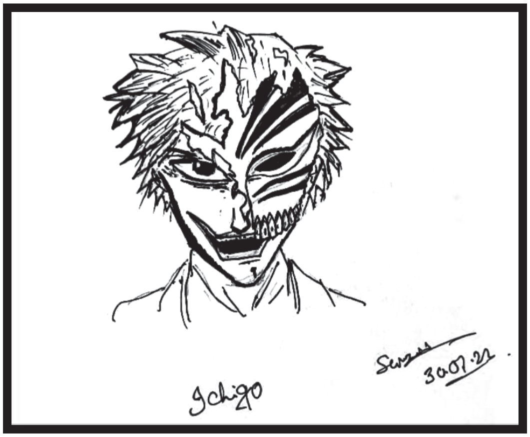

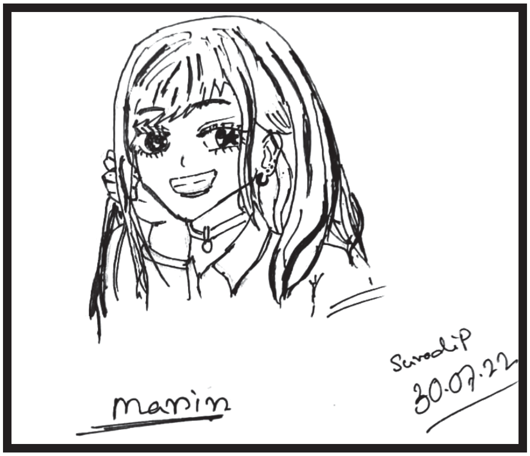

Suvodip Ghosh
B.Sc., 4th Semester

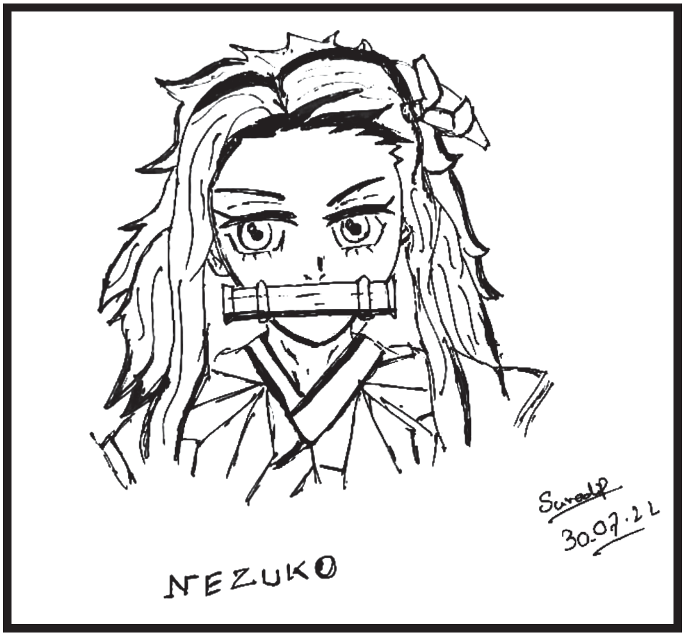

Suvodip Ghosh
B.Sc., 4th Semester

Avik Mondal
B.Sc., 4th Semester

Moumita Biswas
B.Sc., Passed Out Batch 2022

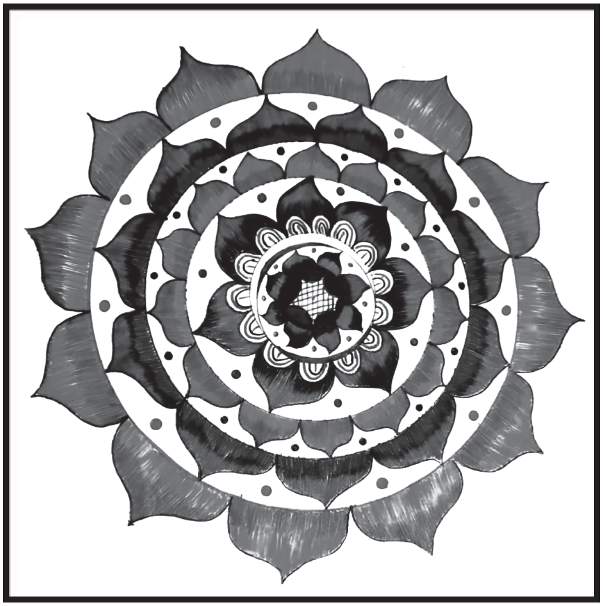

Moumita Biswas
B.Sc., Passed Out Batch 2022

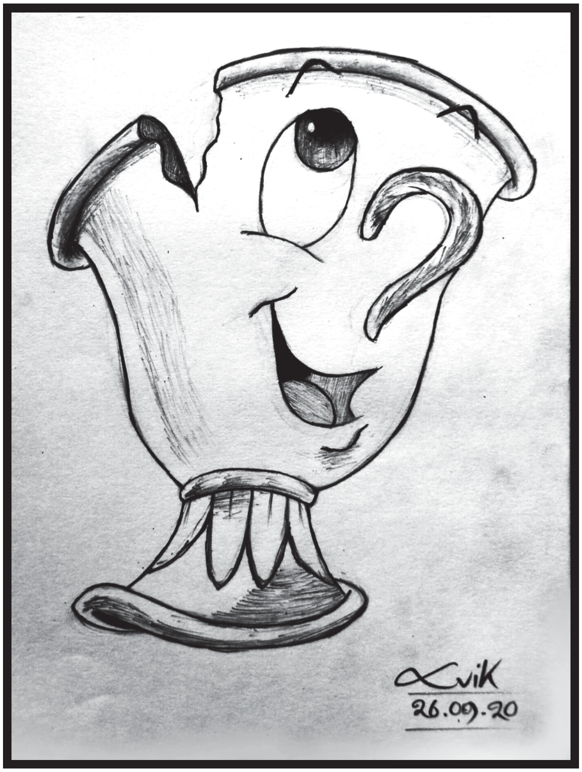

Avik Mondal
B.Sc., 4th Semester

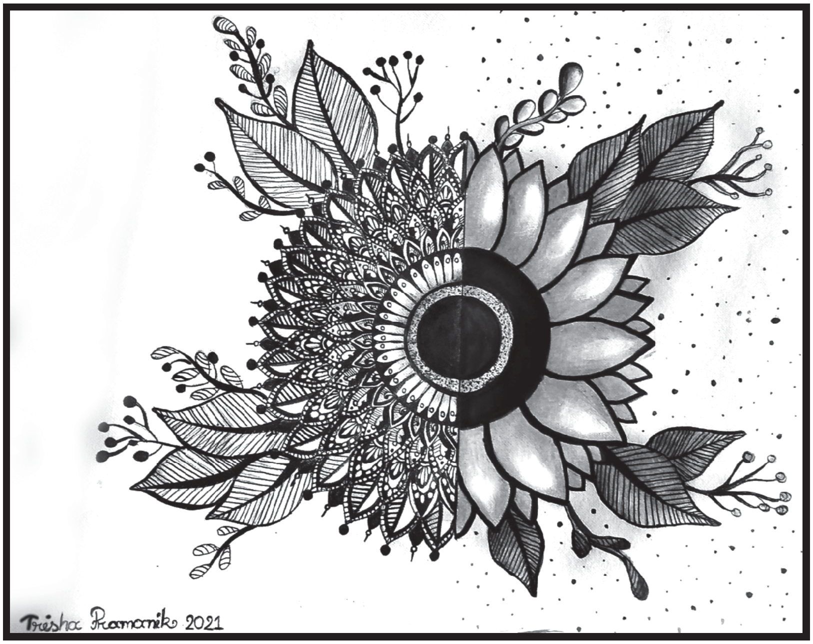

Trisha Pramanik
B.Sc., 4th Semester

Avik Mondal
B.Sc., 4th Semester

Avik Mondal
B.Sc., 4th Semester

Dhriti Mallik
B.Sc., 4th Semester

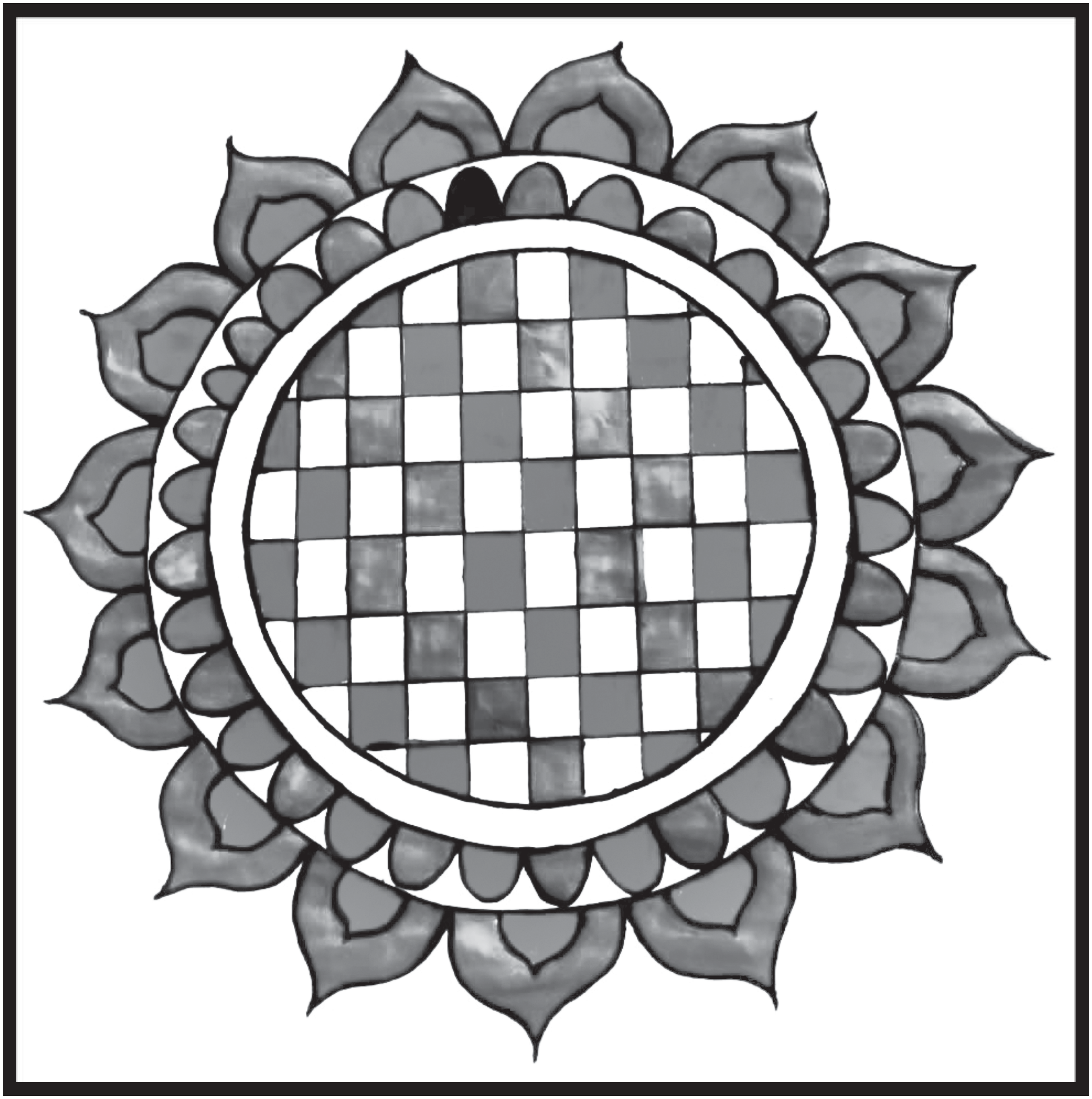

Moumita Biswas
B.Sc., Passed Out Batch 2022

SAYANI DAS
3rd Semester
B.A. General

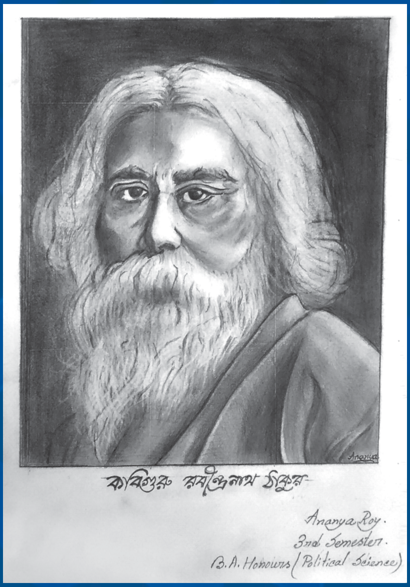

ANANYA ROY
3rd Semester
Political Science (Hons.)

TANMOY DEY
1st Semester,
Chemistry (Hons.)

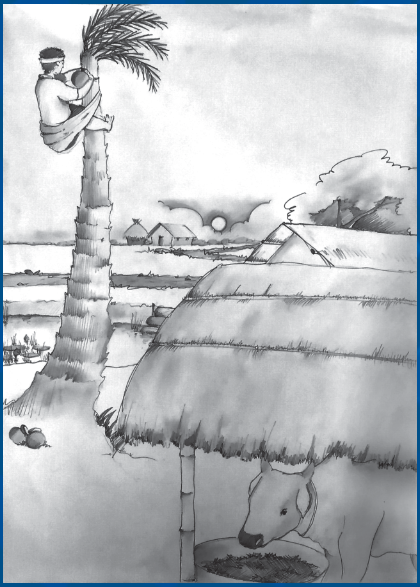

ALIK DEWAN
3rd Semester

BRISHTI DAS
3rd Semester
History (Hons.)

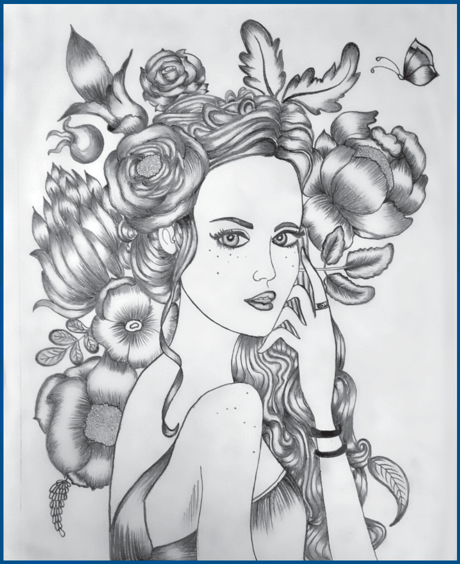

BRISHTI DAS
3rd Semester
History (Hons.)

SANJANA BISWAS
1st Semester
History (Hons.)

SHANTANU KULAVI
6th Semester,
B.Sc., (General)

SANJANA BISWAS
1st Semester
History (Hons.)

SHANTANU KULAVI
6th Semester,
B.Sc., (General)

TANMOY DEY
1st Semester,
Chemistry (Hons.)

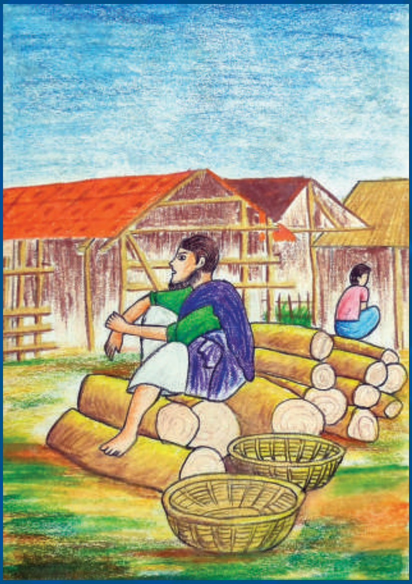

SHANTANU KULAVI
6th Semester,
B.Sc., (General)

TANMOY DEY
1st Semester,
Chemistry (Hons.)

SHANTANU KULAVI
6th Semester,
B.Sc., (General)

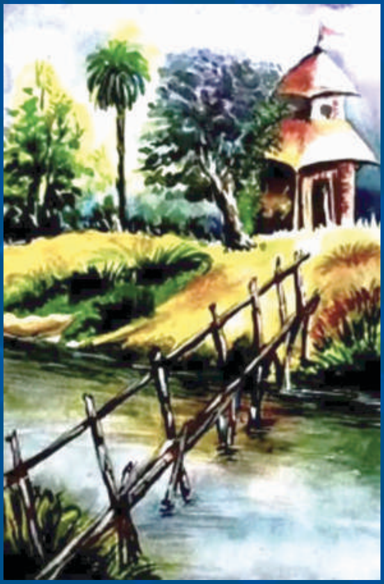

TANMOY DEY
1st Semester,
Chemistry (Hons.)

SHANTANU KULAVI
6th Semester,
B.Sc., (General)

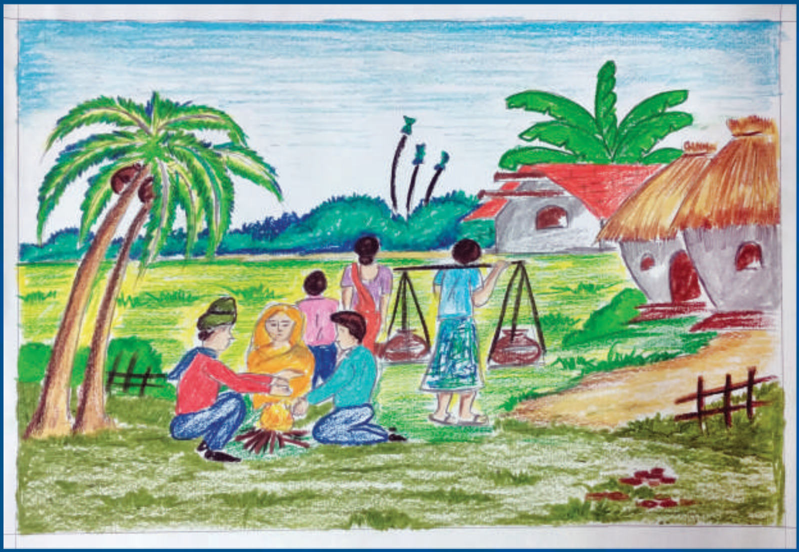

TIYASHA MONDAL
1st Semester

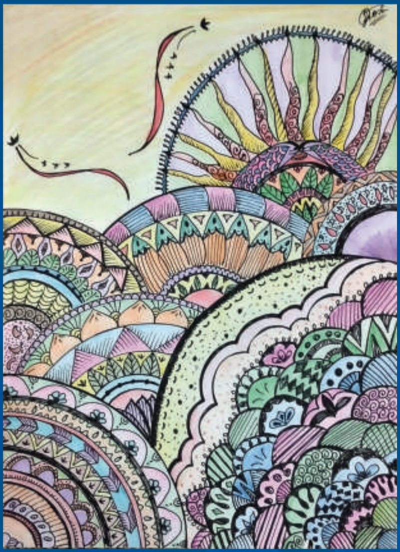

TANAYA GHOSH
6th Semester
Chemistry (Hons.)

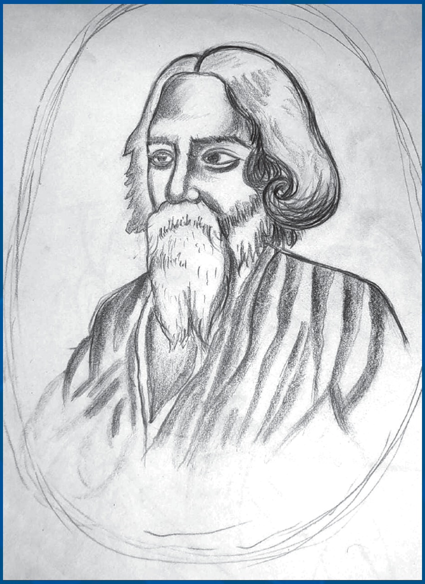

TANMOY DEY
1st Semester,
Chemistry (Hons.)

TANMOY DEY
1st Semester,
Chemistry (Hons.)

TANAYA GHOSH
6th Semester
Chemistry (Hons.)

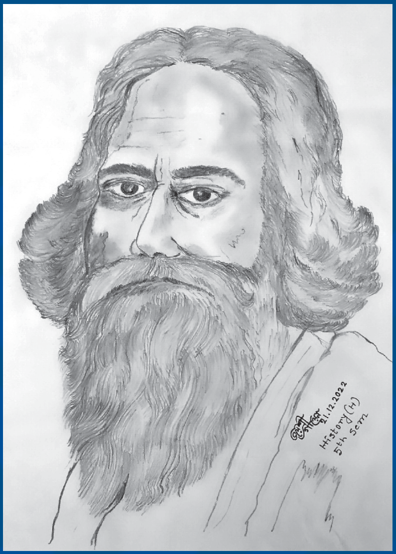

JOYSHREE GAYEN
5th Semester
History (Hons.)

SOUMIK NATH
4th Semester
Philosophy (Hons.)

JUNIA AHAMMED
1st Semester

JOYSHREE GAYEN
5th Semester
History (Hons.)

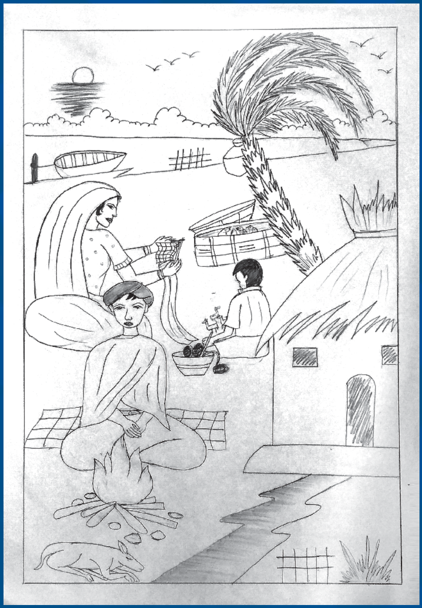

POULAMI DAS
5th Semester
English (Hons.)

SMRITIKANA DAS
5th Semester

***Clay Idol made by* SUBIR SANPUI**

2nd Semester

Department of English

“

We have come to this world to accept it, not merely to know it. We may become powerful by knowledge, but we attain fullness by sympathy. The highest education is that which does not merely give us information but makes our life in harmony with all its existence.

~ Rabindranath Tagore

”

ESTD.1950

TAKI GOVERNMENT COLLEGE

(Affiliated to West Bengal State University)

Taki, Dist. North 24 Parganas, West Bengal, Pin - 743 429